স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস ‘স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক’ ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির ৩য় পর্ব আজ রবিবার, মার্চ ১৯, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৩য় পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-১৬-

আনিস ভাবছে আজ শুধু সাবওয়েতে ঘুরে বেড়াবে। এটার শুরু এবং শেষ কোথায় দেখবে। চার্চ এভিনিউ থেকে উঠে বসল। ট্রেনে অনেক সিট খালি। একটাতে গা এলিয়ে দিল। করিম চাচা বলেছিল যদি ট্রেনে বা বাসে উঠ তবে কারও মুখের দিকে বা সরাসরি চোখের দিকে তাকাবানা।সেই আদেশ অনুযায়ী মাথাটা উপরে উঠাতে ঠিক সাহস পাচ্ছেনা। মাথাটা নীচ করেই বসে আছে। ট্রেন তার গতিতে চলছে তার গন্তব্যে। প্রতি ষ্টেশনে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে, নতুন যাত্রী নিয়ে পৌছে দেবে তাদের গন্তব্যে। কিন্তু আজ আনিসের কোন গন্তব্য নেই। দু’টো কি তিনটে ষ্টেশন পরে ট্রেন যখন থেমে যাত্রী নামিয়ে নতুন যাত্রী নিয়ে চলছে তখন হঠাৎ মনের অজান্তে চোখ গেল দরজার দিকে। এ যে অবিশ্বাস্য! আমাদের গ্রামের জাকির চাচা আমার সামনে দাড়িয়ে! এ কেমন করে হয়? তিনি তো এগার বারে মেট্রিক পাশ করে ঘুষ দিয়ে একটা চাকরি নিয়ে এখন যথেষ্ট ঘুষ খেয়ে চিটাগাং থাকেন। জানতাম ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে আছেন। শুনেছি টাকাকড়ির যথেষ্ট আমদানি আছে। যার নমুনা গ্রামের বাড়ীতে নতুন দালান, জমি জমা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি এখানে কি করে? সন্দেহ দূর করার জন্য তাকিয়েই আছে আনিস। জাকির চাচার হাতে একটা কাগজ। সেখান থেকে কি দেখছেন আর ঠোট নাড়ছেন। এক সময় তিনি আনিসের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। হ্যা, তাইতো! জাকির চাচা! একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে তিনি কথা বলবেন, কিন্তু কিছুই বলছেন না। আনিস নিজেই উঠে দাঁড়াল, কাছে গিয়ে সেলাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? চাচা কোন কথাই বলছেনা।

আবার জিজ্ঞেস করল, কবে এসেছেন এ দেশে? তখন চাচা পকেট থেকে ছোট একটা কাগজ বের করে তাতে ফোন নাম্বার লিখে বললেন, এখন কথা বলতে পারবনা। এই নাম্বারে রাতে ফোন কর। পরের ষ্টেশনে তিনি নেমে গেলেন কোন কথা না বলে।

আনিস একটা ধাঁধাঁয় পড়ে গেল। জাকির চাচা তাকে চিনতে পেরেছে তো! না চিনলে ফোন নাম্বার দিল কেন? চাচার সাথে কত কথা বলার ছিল। কিন্তু কি এমন কিছু যার জন্য তিনি কথা বলতে পারলেন না! অনেক খবর দেয়ার জন্য তার খুব ইচ্ছে ছিল। বিশেষ করে নদীর উপর পুল হয়েছে। এখন রিক্সা বাড়ীর দরজায় যায়। চাচা জানে কিনা কে জানে! অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে ট্রেন শেষ মাথায় এসে থেমে রয়েছে তার খেয়াল নেই। তাকিয়ে দেখে ট্রেন একদম খালি। কেউ নেই। সেও নেমে দাঁড়াল। ষ্টেশনের নাম কনি আইল্যান্ড। তাহলে এটাই শেষ ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে বের না হয়ে আবার আর একটা ট্রেনে উঠে বসল। ৪২ ষ্ট্রিটে এসে ২ নম্বর ট্রেনে চড়ে বসল। আজ নর্থের দিকে দেখে আসবে।

রাত কখন হবে সে অপেক্ষায় রইল আনিস। সন্ধ্যার পর পরই ফোন করল এবং চাচাকে পেয়ে গেল। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, চাচা, আমাকে চিনতে পেরেছেন তো?

কি যে বল! তোমাকে চিনবনা! আমাদের আনু মিয়াকে চিনবনা!

তাহলে সাবওয়েতে আমার সাথে কথা বললেন না কেন?

কারন তখন তো নাম মুখস্ত করছিলাম। কথা বলতে গেলে তালগোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া তুমি আবার নাম ধরে যদি কথা বল, তাই।

কিসের নাম মুখস্ত করছিলেন?

আমার নাম।

কি সব বলছেন? আপনার নাম আবার মুখস্ত করতে হবে কেন?

আরে বাবা, সব কথা তো বলা যাবেনা। তুমি যে তোমার জাকির চাচার সাথে কথা বলছ, সে আমি আর নেই। আমার নাম এখন জমির আলী। শুধু তাই নয়, বাড়ীঘর আত্নীয়স্বজন ছেলেমেয়ে সব বদলে গেছে।

এসব বদল হলকেন?

রাজনৈতিক আশ্রয় নিলে এমনই হয়। যে নামে এদেশে এসেছি সে নাম কম্পিউটারে আছে। রাজনৈতিক আশ্রয় মানে সব মিথ্যা কথা বলা। এইসব মিথ্যাকে চাপা দেবার জন্য গোড়া কেটে ফেলা আর কি! এমন একটা নাম ব্যবহার করা যে নাম তারা কম্পিউটারে পাবেনা। রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর এটাই প্রথম কাজ। নতুন নামে একটা পাসপোর্ট করে দরখাস্ত করে দেয়। আজ আমার ইন্টারভিউ ছিল। তাই ওসব মুখস্ত করছিলাম। আমি আর আগের মানুষ নেই।

তাহলে আপনাকে আর জাকির চাচা বলে ডাকা যাবেনা?

ঠিকই ধরেছ, এখন থেকে আমাকে জমির চাচা বলেই ডাকবে।

নাম যখন বদলই করলেন তাহলে পুরনো আদলের নাম বাদ দিয়ে একটা আধুনিক ধরনের নাম নিলেই তো পারতেন।

এই সেরেছ! এদেশে আধুনিক নাম নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে। নামের কারণে অনেকে এখনও লটকে আছে। এই আধুনিক নামগুলো নিয়ে ইমিগ্রেশন বড় বিপাকে পড়েছে। আমাদের সাথে একজন আছে তার নাম এ কে এম মাহবুবুল হক চৌধুরি। ইমিগ্রেশনের ফরমে আছে ফাষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, মিডেল ইনিশিয়েল। তার মানে নামের প্রথম এবং

শেষটা বেশি প্রয়োজন, মাঝখানের যেটা সংক্ষেপ করা হয়েছে তার এমন কোন প্রয়োজন নেই। যদি মাহবুবের নামটা পুরোপুরি লিখ তাহলে এই দাড়ায়ঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবুল হক চৌধুরী। বুঝ ঠেলা। এক নামে এক পাতা ভর্তি। এই অদ্ভুত নাম নিয়ে ইমিগ্রেশন কোথায় কোন্‌টা দিবে, কি করবে? তাদেরকে বিপদে ফেলে দিলে। এখন ইমিগ্রেশন থেকে তার নামে যে চিঠি আসে তাতে তারা বড়জোড় নামের তিনটা শব্দ ব্যবহার করতে পারে। এখন এ কে এম-এর মানে তারা কিছুই বুঝেনা। তাই নামের আগের সবগুলো শব্দকে একটা তালগোল খিচুরি পাকিয়ে লেখে - একমম হক চৌধুরী। আবার একেক সময়ে একেক রকমের নামে চিঠি আসে। আর আলমের কেইস তো ডিনাই হবে শুনলাম। কারণ নামের ঝামেলা। তার নাম হল মোহাম্মদ রফিকুল আলম চাকলাদার কাজল। মোহাম্মদকে আমরা সংক্ষেপে যেমন লেখি এমডি তেমনি আলমও লিখেছিল - এমডি রফিকুল আলম চাকলাদার কাজল। এই এমডি-কে ইমিগ্রেশন মনে করে ডক্টর অব মেডিসিন বা ডাক্তার। এখন ইমিগ্রেশন তার ডাক্তারি সার্টিফিকেট চেয়েছে। তার লাষ্ট নাম কি, ফেমিলি নাম কি এসব চেয়েছে। তার নামে দেখা যায় কাজল লাষ্ট নেম। কিন্তু আসলে তো তার লাষ্ট নেম হওয়া উচিত চাকলাদার। ফুটানি করে কাজল লাগিয়েছে। এখন বুঝ ঠেলা। এতবড় নাম ইমিগ্রেশনের কাগজে ধরেনা। লাষ্ট নেম বা ফ্যামিলি নেম মেলেনা। ডাক্তারি পাশের সার্টিফিকেট দিতে পারেনা। কয়টা ঝামেলা দেখ। এমনিভাবে অনেক বাঙালী এই নামের ঝামেলায় পড়ে আছে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি! নাম রাখার ব্যাপারে আমাদের কোন কার্পণ্যতা নেই। যতবড় করে পার রেখে দাও। এসব হল তোমাদের আধুনিক নামের ফলাফল। যারা নামের ভুক্তভোগি তাদের সাথে আলাপ করে দেখ কত কান্নাকাটি, কত গালাগালি।

গালাগালি কেন? এবং কাকে?

মা বাপকে। মা বাপেরই বা দোষ কি। তারা কি জানতেন তাদের সন্তান এই স্বপ্নের দেশে এসে নামের ঝামেলায় পড়বে? তা জানলে তো আমার মত ছোট নামই রাখতেন।

আনিস বলল, পাসপোর্টে নাম ছোট করে লেখালেই তো হয়। নাম যত বড়ই হোক, থাকনা সেটা তার হাতে।

আরে সেটাই তো যত ঝামেলা। পাসপোর্টে তো সংক্ষেপ করেনা, বরং আরও বেশি কিছু যোগ করে দেয়। ঠিকানা পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম কয়েক মাস আগে। এক পীরছাহেব এসেছেন প্রবাসী বাঙালিকে নছিহত করার জন্য। তিনি প্রতি সপ্তাহে ওয়াজ করেন বিভিন্ন জায়গায়। তারও স্বপ্ন আছে এই কাফেরের দেশে মুসলমান/অমুসলমানকে আল্লাহর পথে আনয়ন করা। শুনলাম তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এই স্বপ্নের দেশে। খুব শীঘ্রই আমাদের পীর ছাহেব ঝামেলায় পড়বেন। কারণ তার নামের যে বাহাদুরি তা দেখলে ইমিগ্রেশন একটা বিপদে পড়ে যাবে। শুনবে তার নামটা?

বলুন শুনি।

তার নাম হল হজরত কেবলা পীর পাগলা সৈয়দ শাহ সুফি আলহাজ মৌলানা বিস্কুটি। ভাতিজা, শুনছ? দেখেছ নামের বাহাদুরি? এখন বল তার ফার্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, মিডল ইনিশিয়েল কোনটা। এখানে কয়টা নাম? আসল নাম কোনটা? কোন নামে তাকে ডাকবে? খেয়াল করে

দেখ আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী এখানে কোনটাই তার নাম নয়। বিস্কুটি কোন নাম নয়। হয়ত বা সে বিস্কুট খুব খায়। তাই বিস্কুটি বলে।

বলেন কি? এটা কোন মানুষের নাম হয়? আপনি বানিয়ে বলছেন নিশ্চয়ই।

আমি বাড়িয়ে বলব কেন? তার বাড়ী সিলেট। তিনি তো আমার পরের ব্লকেই থাকেন। এসেছেন এখানে ওয়াজ নছিহত করে কিছু পয়সা নেবার তালে। এটা হল তার দ্বিতীয়বার আগমন। প্রথম বার এসে পকেট যথেষ্ট ভারী করে ফিরে গিয়ে আবার লোভে পড়ে এসেছেন। আর প্রবাসেও কিছু আল্লাভক্ত আছেন যারা কষ্ট করে হলেও আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্তহস্তে হুজুরকে দান করেন। এবার এসে লোভ একটু বেড়ে যাওয়ায় তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। অবশ্য যথেষ্ট মিথ্যা বলে দরখাস্ত করতে হয়েছে। সত্যি কথা বললে তো দরখাস্ত করা যায়না।

মিথ্যা কথা বলে কিছু নেয়া কতবড় পাপ তিনি কি জানেন না?

আরে দুর! তোমার সাথে কথা বলে আরাম নেই। হুজুর তো নিজেই ফতোয়া তৈরি করে। এই মিথ্যা বলাকে তিনি নিশ্চয়ই কোনভাবে জায়েজ করে নিয়েছেন। বেশি ঝামেলায় পড়ে গেলে বলবে, আল্লাহ সব মাফ করে দেন।

তিনি গ্রীন কার্ড পাবেন না। কারন তার নিজের কোন নাম এখানে নেই। আনিস বলল।

তুমি বুঝ নাই ভাতিজা। নামডা এইখানে ফ্যাক্টর না। নামটা কুত্তা, বিলাই, ছাগল ভেড়া, কিস্কুট যাই রাখ তাতে কোন অসুবিধা নাই। শুধু ফরম অনুযায়ী রাখলেই হয়। এই ধর যদি ফার্ষ্ট নেম লেখে পাগলা, লাষ্ট নেম লেখে বিস্কুটি, আর মিডেল নেম যদি হয় কেবলা, তাহলেই সব ঝামেল শেষ। তাই অনেক পরামর্শ করেই আমার এই ছোট নামটা ঠিক করেছি। কোন ঝামেলা হবেনা। একবারে সোজা।

এতসব খবর আপনি জানলেন কি করে?

গ্যাড়াকলে পড়ে গেলেই অনেককিছু শিক্ষা হয়। আমাদের নাম নিয়ে কত মানুষ যে কত ঝামেলায় পড়ে আছে তার খবর কে রাখে। মানুষের সাথে আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। লাষ্ট নেম মানে শেষের নাম নিয়েও বহু ঘটনা আছে। এখানে একটা কথা আছে ফ্যামিলি নেম, তার মানে আমাদের দেশে যেটা পদবী। যেমন ভূইয়া, মিয়া ইত্যাদি। ধর তোমার নাম আনু মিয়া, তোমার ছেলের নাম খুব সখ করে রেখেছ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। এই নাম নিয়ে যদি ইমিগ্রেশনে যাও তাহলে তোমার খবর আছে। প্রথমেই দেখবে তোমার লাষ্ট নেম আর তোমার ছেলের লাষ্ট নেম এক কিনা। যদি না হয় তাহলে এর জবাব দিতে দিতে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে করতে বছরখানেক চলে যাবে। আমাদের দেশের মেয়েদের নিয়েও মহা ঝামেলা। খুব কম মহিলার নাম তাদের স্বামীর শেষের নামের সাথে মিল আছে। ধর তোমার নাম দুখু মিয়া, আর তোমার স্ত্রীর নাম কুলসুম বেগম বা খাতুন অথবা খানম এ ধরনের কিছু একটা যা তোমার নামের সাথে কোন মিল নেই। ইমিগ্রেশন তাদের নিয়ে মহা বিপদে আছে। এই তো কিছুদিন আগে এক মহিলার ছেলে হয়েছে। ছেলের বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েছে বেগম নামে। কারণ বাচ্চার মায়ের লাষ্ট নেম বেগম। তারা মনে করেছে বাপের লাষ্ট নেমও বেগম। এদেশে পরিবারের সকলের লাষ্ট নেম এক থাকে এবং থাকা উচিত। তাহলে অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ইমিগ্রেশনের কাজেও সুবিধা হয়।

এসব কথা তো বাংলাদেশের মানুষ জানেনা, আনিস বলল।

জানেনা যখন জানাতে হবে। তোমাদের আধুনিক নামগুলো বদল করতে হবে যদি বিদেশে যাও বা থাক। শুধু বিদেশে কেন, আমাদের দেশেও প্রয়োজন হবে। কাজেই ভবিষ্যতে যারা নাম রাখবে তাদের প্রতি আমার এই উপদেশ তারা যেন ছেলেমেয়ের নাম রাখার সময় পরিবারের লাষ্ট নেমটা ঠিক রাখে। আর পরিষ্কারভাবে তিনটা ভাগে নামটা রাখতে হবে। এটাই নিয়ম।

আপনার কাছে নতুন অনেক কিছু জানতে পারলাম।

তুমি কিভাবে এসেছ, কোন ভিসায়?

আমি ওপি ওয়ান লটারিতে এসেছি।

তাহলে তো তোমার এসব ঝামেলা নেই। কবে এসেছ?

এইতো দু মাস হল।

কিছু করছ?

না, এখনও কিছু শুরু করিনি।

তুমি সব দিক থেকেই সুখে আছ। কোন চিন্তা নেই। আমরা তো এসেই কাধে জোয়াল নিতে হয়েছে। আর কাগজ ছাড়া কম পয়সায় কাজ করতে হচ্ছে। এদিক থেকে তুমি ভাল আছ।

আপনি কি করেন চাচা?

আমি রাস্তায় বসে বই বেচি। তবে আমার বই নয়। আর একজনের দোকান মানে সে এখানকার ব্যবসায়ী- বই দিয়ে বসিয়ে দিয়ে যায়। সারাদিন যা বিক্রি হয় তা তার নিজের। আমাকে দৈনিক বেতন দেয়।

কি রকম দেয়?

পঞ্চাশ ডলার দেয।

তাহলে তো ভালই। কোন পরিশ্রম করতে হয়না। আমার মনে হয় অন্য কাজের চেয়ে এটা অনেক ভাল।

তা ঠিক। পরিশ্রমের কাজ তো আর করতে পারিনা। বয়স হয়েছে! তুমি একদিন আমার এখানে বেড়াতে এস। অবশ্য সন্ধ্যার পরে আসতে হবে। কারণ আমি সাতদিন কাজ করি।

আচ্ছা আসব।

-১৭-

খাওয়া দাওয়ার পর দু'বন্ধুতে বসে গল্পে মজে গেল। প্রথমেই শুরু করল আমানের পরিবার দিয়ে। তার কোন বাচ্চাটা কত বড় হয়েছে, তার টেবিলে রাখা ছবি দেখিয়ে কথা বলতে বলতে এক সময় চোখ টলমল করে উঠল। আনিস বলল, তোর কাজের কথা বল। কি কাজ করিস, কিসের দোকান, তো কাজটা কি? কয় ঘন্টা কাজ করিস?

ওটা একটা পিজ্জার দোকান। পিজ্জা বললে শুধু পিজ্জাই বুঝবিনা। এতে অনেক রকমের খাবার থাকে। তবে পিজ্জাটাই প্রধান। এটা খুব সস্তা খাবার, সর্টকাট। সময় কম লাগে। তাই মানুষ এটা বেশি পছন্দ করে। বিশেষ করে লাঞ্চ টাইমে। কারও সময় নেই। মানুষ হাটতে হাটতেও পিজ্জা খেতে পারে। অনেকে দোকানে আসেনা। অফিসে বা বাসায় বসে অর্ডার দেয়। ঠিকানা নিয়ে ডেলিভারী দিয়ে আসি। দুপুরে যা অর্ডার হয় তা সবই অফিস বা কাজের জায়গায় বলতে পারিস। এক সাথে এত অর্ডার হয় যে ডেলিভারী দিয়ে কুলিয়ে উঠা যায়না। দশ জনের মত ডেলিভারীর মানুষ আছে। সবাই দৌড়ের উপর থাকে। যে যত বেশি ডেলিভারী দিতে পারে সে তত বেশি টাকা কামায়। প্রতি ডেলিভারীর জন্য একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক আছে, তাছাড়া টিপস আছে। টিপসের কোন আগা মাথা নেই। কোনদিন একশ ডলারও হয়ে যায়

আবার কোনদিন দশ পনের ডলার। তবে এভারেজ পারিশ্রমিকসহ একশ ডলারের কম থাকেনা।

কয় ঘন্টা দৌড়ের উপর থেকে এই একশ ডলার মিলে?

ধর, ছয় ঘন্টা। লাঞ্চের সময় বারটা থেকে তিনটা পর্যন্ত। তারপরই সব শান্ত। ডিনার শুরু হয় ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত। তারপর যা আসে তাতে না দৌড়লেও চলে। ডিনারে বেশিরভাগই হয় বাসায়। যারা পিজ্জা দিয়ে ডিনার করে তারা রান্নার ঝামেলায় যায়না, আবার বেশি খরচ ও করতে পারেনা। বলতে পার এরা আমাদের যেমন মিডল ক্লাস সে রকম।

টিপস কোথা থেকে পাও? কারা বেশি দেয়?

অফিস থেকেই টিপস বেশি মেলে। মাঝে মাঝে বাসা থেকেও বড় আকারে টিপস মেলে যদি ক্রেতা পানরত থাকে এবং অনেকটা অপ্রকৃতস্থ থাকে। উইন্টারে মানুষ কম বের হতে চায়। তাই উইন্টারেই অর্ডার বেশি থাকে। লাঞ্চ এবং ডিনার দুটোই। উইন্টারেই বেশি কষ্ট হয়। ধর অনবরত বরফ পড়ছে, তোমার বিরাম নেই। থামতে পারবেনা। দেরি করতে পারবেনা। কারন অর্ডার দেবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, কতক্ষন লাগে ডেলিভারী আসতে। যদি দেরী হয় তা হলে ক্রেতা দোকানে ফোন করবে। এখনও কেন ডেলিভারী আসেনি। তাতে তোমার চাকরি যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই ঝড় বৃষ্টি, যত ঠান্ডাই হোক, পথঘাট বরফে আবৃত্ত থাকুক, তোমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে। কত ঘটনা যে দেখলাম এই ডেলিভারী করতে গিয়ে! বাঙালীও যে এখানে এমন জীবন যাপন করে তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। বাসায় ডেলিভারী করতে গিয়ে উলঙ্গ মহিলা-পুরুষ দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। গায়ানা, ত্রিনিদাদের মানুষ অনেকটা আমাদের মত। খাওয়া দাওয়া, চালচলন আমাদের সাথে খুব মিল। কারন তাদের পূর্বপুরুষ ভারত থেকে আগত। কালে কালে তাদের চালচলন বদলে গেছে। পশ্চিমা রীতিনীতি গ্রহন করতে গিয়ে পশ্চিমাদের ছাড়িয়ে গেছে। তারা যখন পার্টি করে তখন তাদের পোষাক আশাক গায়ে থাকে কিনা তাও তারা ভুলে যায়। আনন্দ ফুর্তি চলে সারা রাত। আর তার সাথে সস্তা পানীয় আর সস্তা খাবার। মাঝে মাঝে তারা টিপস দিতে কার্পণ্য করেনা। তারা তখন থাকে অন্য জগতে। কোন হিসাবের ধার ধারেনা। আবার কোন কোন মানুষ এক পয়সাও টিপস দেয়না। এশিয়ান মানে চাইনীজ, জাপানি এবং ইটালিয়ানরা টিপস দেয়না বলতে পার।

তুই যে বললি বাঙালীর জীবন যাপনের কথা, সেটা কি রকম?

আমার এই দু'বছর ডেলিভারী জীবনে মাত্র দু'তিনটা বাঙালীর বাসায় ডেলিভারী দিয়েছি। খুব কম বাঙালীই অর্ডার দেয়। যারা বাইরে খেতে চায় তারা চলে যায় ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে। ইন্ডিয়ান মানে পাকিস্তানী, বাঙালি বা ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট। সেখানে তারা খেয়ে তৃপ্তি পায়। এসব পিজ্জা ফিজ্জা বাঙালীরা খুব একটা খায়না। কেউ কেউ সখ করে খায়। যে বাসার কথা বলছি সেটা হল ডাউন টাউন ম্যানহাটানে। একটা পুরোনো বাড়ী। ভাড়া কম। সেখানে যে বাঙালী থাকে জানতাম না। ডেলিভারী নিয়ে যখন দরজার কড়া নাড়লাম একজন এসে দরজা খুলে দিল। লোকটা মুখোমুখি হতেই আমি থ হয়ে গেলাম। মনে হল খুব চেনা চেনা। আমার মন বলছে সে বাঙালী। আমার একটা অনুমান আছে। সে অনুমানটা খুব ভুল হয়না। বিদেশে মানুষ চেনার। চেহারা দেখে আমি বলে দিতে পারি সে কোন দেশের হতে পারে। বাঙালি, ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানী কিভাবে আলাদা করা যায় সেটা আমার একটা

হিসেব আছে। বাঙালীর মুখে ভাতের একটা ছাপ আছে। সেটা হল দেখবি মুখে একটা মোলায়েম ছাপ, একটা আলাদা লাবন্যতা, অনেকটা নিরীহ ভাব। সেটা শুধু ভাতের ছাপ। গায়ের রং যাই হোক ছাপ বদল হয়না। পাকিস্তানীর মুখে একটা রুক্ষতার আবরণ থাকে, সেটা রুটির ছাপ। আর ইন্ডিয়ানদের মাঝামাঝি একটা ছাপ আছে, না রুক্ষতা, না লাবন্যতা। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ান সনাক্ত করতে আমার অনুমান ভুল হয়ে যায়। যাই হোক, যে লোকটা দরজা খুলে দিল সেও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রথমে কেউ কথা বলতে পারছিনা। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে লোকটা জিজ্ঞেস করল, হাউ মাচ ইজ দি বিল?

বললাম টুয়েন্টি টু ডলার। দুজনের ইংরেজি বলার ধরনও কিন্তু বলে দিচ্ছে আমরা একই জাতের। আমাদের ইংরেজি উচ্চারন অন্যান্য দেশের চেয়ে আলাদা। এসময় ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠ বলে উঠল, নুজরুল, তুমি দিয়ে দাও।

তখন ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম। একজন মহিলা একটা টেবিলের সামনে বসে আছে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার চুল বব কাটিং, টানা ভ্রু, মেক আপ করে মুখের আসল রঙ বদলে ফেলেছে বলে মনে হল। গালগুলো দেখতে লাল আপেলের মত দেখায়। কাজলটানা মায়াবি চোখ, মনে হয় ঘুমে ঢুলু ঢুলু। বাম হাতে সিগারেট জ্বলছে, ডান হাতে একটা গ্লাস, রঙিন পানীয়। টেবিলে দু'তিনটা বোতল। তার ডানদিকে চেয়ারে বসা দুজন পুরুষ, সামনে দুজন। সবাই পানরত। সকলের হাতেই গ্লাস। সিগারেট জ্বলছে সকলের হাতে। একজন ভেতর থেকে উঠে এসে আমাকে গুনে বাইশ ডলার দিয়ে ফিরে গেল। যে লোকটা দরজা খুলে দিয়েছিল সে দরজার বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, আর ইউ ফ্রম বাংলাদেশ? বললাম, ইয়েস। তখন সে আমার ফোন নাম্বারটা জানতে চাইল এবং বলল, তার একটা কাজের খুব দরকার। যদি সাহায্য করতে পারি। আমি বললাম, আমি যে কাজ করি তা যদি করতে পারেন তাহলে চেষ্টা করে দেখব। এই রিসিটেই আমার ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা আছে।

পরের দিনই সে এসে হাজির। আমি তখনও গিয়ে পৌঁছাইনি। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি আসতেই সে তার নাম বলল কালাম। আমার মালিকের কাছে নিয়ে গেলাম এবং কাজও হয়ে গেল। কালামের কাছ থেকেই তাদের কাহিনী শুনলাম।

ওরা সাতজন থাকে ওই বাসায়। বাসাটা নিয়েছিল সেই মহিলা। নাম নাজনিন ভাবী। তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন ভিজিট ভিসায়। কোন এক আমলার স্ত্রী। আমলা নিজেও এসেছিলেন দেশ ভ্রমনে। বলতে পার আমেরিকা জিয়ারত করতে এসেছিল। জিয়ারত শেষে ভদ্রলোক ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে বললেন স্ত্রীকে। স্ত্রী ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। দু'মাসে এখানে অনেকের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছে। তারা মহিলাকে পরামর্শ দিয়েছে ফিরে গিয়ে কাজ নেই। এখানে এই স্বাধীন দেশ ছেড়ে পরাধীন জীবনে কেউ ফিরে যায়! এখানে কাজের কোন অসুবিধা নেই। একজনের জীবন খুব আরামে কেটে যাবে। তাই তিনি ফিরে যাবেন না এই স্বপ্ননগর ছেড়ে। তার অনেক স্বপ্ন আছে এই জীবনকে নিয়ে। অনেক অনুনয় বিনয়, মান অভিমান, কোন্দল, ঝগড়া ঝাটির পর সে আমলা দেশে ফিরে গেলেন। একা। তার স্ত্রী রয়ে গেল। এসেই ওই বাসায় উঠেছিলেন। নাজনিন ভাবী খুব হিসেবি। তিন কামরার বাসা। তাই দু'টি কামরা ভাড়া দিয়ে দিলেন অন্য একটা বাঙালী পরিবারকে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাঙালী

মহিলা আর নাজনিন ভাবী চুলোচুলি হবার দশা। বিষয়, নাজনিন ভাবী মহিলার স্বামীর সাথে ফষ্টিনষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত তারা বাসা ছেড়ে চলে যায়। তখন অন্য কোন পরিবার না পেয়ে এই ব্যাচেলরদেরকে ভাড়া দেয়। এই ব্যাচেলররা ভাবীর সকল প্রকার সেবাযত্ন করার জন্য উদগ্রীব থাকে। ভাবী এইসব সেবা এবং যত্ন উপভোগ এবং ভোগ করেন। বিনিময়ে ভাবী সকলকেই খুশী রাখেন। ভাবীর কোন কাজ কর্ম করতে হয়না। যখন যা চায় তা পায়। যোগান দেয় ব্যাচেলররা। কালামের কাজ নেই। থাকার জায়গাও ছিলনা। ওদের একজনের সাথে পরিচয় ছিল। অস্থায়ীভাবে এখানে এসে উঠেছে। কিন্তু তাদের কাজকর্ম দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ। বাসায় খুব একট রান্না হয়না। বেশিরভাগ বাইরে থেকে নিয়ে আসে। ভাবী পছন্দ করে তাই। একেকদিন একেকজন ব্যবস্থা করে। ভাবী একা একটা রুমে থাকে। একা ঘুমোতে পারেনা। তাই রাতে একজন না একজন ভাবীকে সঙ্গ দেয়। এমনি চলছে তাদের জীবন। মহিলার স্বপ্ন সফল হচ্ছে। আর কালাম কাজ পাবার এক সপ্তাহ পরেই সে বাসা ছেড়ে দিয়েছে। এ পর্যন্ত বলে আমান থামল। তারপর বলল, চল ঘুমাতে যাই। কাল আবার কাজ আছে।

-১৮-

বাসার অন্য চারজনের সাথে আনিসের পরিচয় হয়েছে। হানিফ ভাই বয়োজ্যেষ্ঠ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। চুলে পাক ধরেছে। কথাবার্তায় পন্ডিতি ভাব। তিনি সবজান্তা। কাজ করেন সিক্সথ ষ্ট্রিটে একটা বাঙালী রেষ্টুরেন্টে। শেফ। এদেশে শেফের অনেক চাহিদা। ছোট বড় সব হোটেল রেষ্টুরেন্টে। হানিফ কাগজের সব রাস্তাগুলো চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আর কোন আশা নেই। তাই বাঙালী রেষ্টুরেন্ট ছাড়া তার কোন কাজ পাবার সাম্ভাবনা কম। তিনি হতাশ। সবকিছুতেই একটা হতাশার ভাব। এখন একটাই পথ আছে এখানে বিয়ে করে কাগজ পাবার ব্যবস্থা করা। যাকে বলে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ। তাতে ব্যক্তিবিশেষে পাঁচ থেকে দশ হাজার ডলার লাগে। এই টাকা খরচ করে বিয়ে করলে তিন/চার বছর সময় লেগে যায় গ্রীন কার্ড পেতে। তারপর যার যার পথে চলে যায়। ছাড়াছাড়ি। মুক্ত। এই কয় বছর বিয়ে করা মহিলার সব খরচ পত্রও দিতে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। এসব নিয়েই হানিফ ভাই দিন রাত ভাবেন। অঙ্ক কষেন। মিলেনা। এখন কি করবে! দেশে স্ত্রী, সাত বছরের একটি ছেলে, পাঁচ ও চার বছরের দুটি মেয়ে আছে। এখন এই বয়সে আর একটি বিয়ে করা কতটুকু সমীচীন হবে তাই ভাবছে। তাছাড়া উপায়ই বা কি!

বাংলাদেশেও ফিরে যাবার চিন্তা করা যায়না। আর্মির রিটায়ারড অফিসারের সাথে কন্ট্রাক্টরির প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তার এই পরিণতি। দেশের সমস্ত ব্যবসা তখন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারের হাতে। সবকিছুতেই আর্মি। ২০ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে তা আর ফেরত দেবার কোন অবস্থাই রইলনা। তখন শেষ সম্বল তিন লাখ টাকা দিয়ে এক ট্র্যাভেল এজেন্টকে ধরে পাড়ি দিয়েছে এই স্বপ্নের দেশে।

হানিফ ভাইর রুমমেট রফিক। বয়স তিরিশের কোঠায়। কাজ করে একটা ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে। বাস বয়। দেশে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হয়। একটি বোন কলেজে পড়ে, একটি ভাই স্কুলে। অকালে বাবা মারা গেলে কলেজ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে এই স্বপ্ন নগরে। শেষ জমিজমা বিক্রী করে এক মামার সাহায্যে এখানে পৌছতে পেরেছে। মা সব কিছু

দেখাশোনা করে। এক মাস টাকা না পাঠালে মহা বিপদ। তার স্বপ্ন, পরিশ্রম করে টাকা জমাবে, তারপর নিজে একটা রেষ্টুরেন্ট করবে। রাত দিন পরিশ্রম করে। একটু বসে গল্প করার সময় নেই।

মাঝখানের রুমে থাকে জগলু আর কাশেম। জগলুর বয়স ২৪/২৫ হবে। প্রিন্সের মত চেহারা। দেখলে বাঙালী বলে মনে হয়না। ধনী মাতাপিতার সন্তান। নিজেদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে বিদেশে পাঠিয়ে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে তার মাতাপিতা। সে অনেক খুনের আসামী। বাংলাদেশে ছিল একটা ত্রাস। যেখানেই গেছে সেখানেই ত্রাসের সৃষ্টি করত। কলেজে নাম ছিল, কিন্তু কোন দিন ক্লাশে যেত না। যেখানে যেমন মাস্তানির প্রয়োজন তাই করে বেড়াত। বহু চেষ্টা করে তার মাতাপিতা তাকে বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। এখানে সে কি করে সেটা বড় কথা নয়। সে যে বাংলাদেশের বাইরে আছে তাতেই তারা শান্তিতে আছে। প্রয়োজন হলে তারা টাকা পাঠাতেও প্রস্তুত। কিন্তু জগলু এখানে নিজকে চালিয়ে নিচ্ছে নিজের রোজগার করা টাকা দিয়েই। তবে এক খান কথা আছে। কোন কাজেই বেশিদিন টিকেনা। এই দু'বছরে গোটা পাঁচিশেক কাজ বদল করেছে অথবা বদল করতে বাধ্য হয়েছে। বেশির ভাগই ফায়ারড। এদেশে কাজে ফাঁকি দিলে কিছুই বলেনা। শুধু বলে দেয়, খুব ভদ্র ভাষায়, তুমি কাল থেকে কাজে এসোনা। যখন দরকার হবে তখন তোমাকে কল দেব। কল আর দেয়না।

আর একখান কথা আছে। জগলু পান করে। সরবত নয়, মদ পান করে। যথেষ্ট পরিমানে। যখন তখন। কাউকে তোয়াক্কা করে পান করে না। কখনও একা, কখনও বন্ধুদের সাথে। মাতাল হলে কথা কম বলে। জগলুর অনেক বন্ধু আছে। এদেশের ভাষায় যাকে বলে ফ্রেন্ড এবং গার্ল ফ্রেন্ড। বর্তমানে গার্ল ফ্রেন্ড তিনজন। একজন সাদা, একজন গায়ানিজ আর একজন চাইনিজ। তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে কাজ করতে গিয়ে। মাঝে মাঝে বাসায় আসে বন্ধু নিয়ে, যখন কাশেম থাকেনা। দরজা বন্ধ করে কিসব পরামর্শ করে কে জানে!

কাশেম যেন বাসার কাজের লোক। যখনই বাইরে থেকে আসে তার হাতে বাজারের একটা ব্যাগ থাকে। যতক্ষণ ঘরে থাকে রান্নাঘরে। খাদ্য বিলাসী। সব সময় ভাল ভাল খেতে চায়। যারা খাদ্য বিলাসী তারা পরের হাতের বাজার পছন্দ করেনা। তাই সে নিজে বাজার করে, নিজে রান্না করে। অবশ্য এই চার জনের জন্য। বয়স ৩৫/৩৬ হবে। বিবাহিত। এক সন্তানের পিতা। এসেছে গলা কেটে। আদম বেপারী। আদমের টাকা আত্মসাত করে নিজেই আদমের গলা কেটে পাড়ি দিয়েছে স্বপ্নের দেশে। কাজ কর্মের জন্য খুব একটা চিন্তা ভাবনা নেই। যথেষ্ট পরিমান টাকা নিয়ে এসেছে। কত এনেছে কেউ জানেনা। কারও সাথে আলাপও করেনা। নিজের ভাবে চলে। কারও সাতে পাঁচে নেই। দেখতে মনে হয় সরল সোজা, নিরীহ গোবেচারা। এই বেচারা যে শত শত মানুষকে পথে বসিয়ে দিতে পারে কেউ ভাবতেও পারেনা। এখানে অনেকটা পালিয়ে ছিল। কি করে যে খবর হয়ে যায় সে আদম বেপারী ছিল। কার ভাইকে পথে বসিয়ে এসেছে। সেই নাকি ধরে ফেলেছে। বেশি ঝামেলা হয়নি। চাওয়া মাত্র টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে। এখানে এমন পাওনাদার আর নেই। শুধু একজনই ছিল। মিটিয়ে দিয়েছে। এখন নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে দিন কাটাচ্ছে। স্ত্রীপুত্রের খবরাখবর মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু এখানে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। বাংলাদেশে স্ত্রীও পালিয়ে বেড়াচ্ছে পাওনাদারের জ্বালায়। আজ চার বছর। যুবতী

সুন্দরী স্ত্রী। কতদিন এমনিভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে সে নিজেই জানেনা। এখানে নিয়ে আসার কোন স্বপ্নও কাশেমের নেই। মনে হয় তার কোন চিন্তা নেই স্ত্রীপুত্রের জন্য। কাজ করে একটা ফাষ্ট ফুডের দোকানে। ক্যাশিয়ার। সকাল দশটা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত। তারপর চার্চ এভিনিউতে বাজার করে ঘরে ফেরা। মজার মজার রান্না করা, খাওয়া। এই তার জীবন। এসব দেখে আনিসের মনে হল সে নিজেই একমাত্র বেকার। চাচীর পয়সা বসে বসে খাচ্ছে। এ অন্যায়।

আমানকে বলল, আমাকে একটা কাজ দে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। বসে বসে খেতে খুব খারাপ লাগছে।

তোর তো আর নুন আনতে পানতা ফুরায়না! আমাদের মত এত ছোট কাজ করার আগে ভাল করে চিন্তা কর। তোর চাচা কি বলে দেখ। তারপর ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিস। এসব কাজতো যে কোন সময় পাওয়া যায়।

-১৯-

শনিবারে বাহারের বাসায়। সেদিন আনিস পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেল। গিয়ে দেখে ঘরে আরও নতুন মুখ। অনেকগুলো বাচ্চা ছুটোছুটি করছে। বাহার পরিচয় করিয়ে দিল। এ হল জাহাঙ্গীর। ঢাকা ইউনিভার্সিটির তুখোড় বক্তা। জাসদ করত। এখানে কমিটি ফর ডেমক্রেসি'র সভাপতি। একজন জাদঁরেল সেলসম্যান। ভ্যাক্যুম ক্লিনার আর বিশুদ্ধ পানি পান করার মেশিন বিক্রি করে। কাগজের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৮৮ সালের স' প্রোগ্রামে দরখাস্ত করেছিল। ডিনাই হয়েছে। পলিটিক্যালের পথ ও শেষ হয়ে গেছে। এখন আল্লার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছে। মানুষ যখন নিজে ব্যর্থ হয় তখন কোন উপায় না থাকলে আল্লার উপর ছেড়ে দেয়। তবে এর মাঝে সবচেয়ে বড় কাজটা সমাধা করে ফেলেছে। স প্রোগ্রামে দরখাস্ত করার পর একটা অস্থায়ী গ্রীন কার্ড দিয়েছিল। সেই কার্ড নিয়ে বাংলা দেশে গিয়ে শাদীমোবারক শেষ করে ভাবীকে একবারে সাথে নিয়ে চলে এসেছে। দেখ, কেমন একখান জিনিষ নিয়ে এসেছে! এই যে পারুল ভাবী। পরিচয় করিয়ে দেই। আমাদের আনিস। ওপি ওয়ান। নাম্বার ওয়ান। সবদিক দিয়েই আনিস নামবার ওয়ান। দেখুন কেমন হিরো হিরো চেহারা। এই হল পারুল ভাবী। জাহাঙ্গীর ধরে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ থেকে। তবে বিয়ের সময় জাহাঙ্গীরের দুপাশে দুজন গার্ড ছিল। শাদী মোবারক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা তার চুল গার্ড দিয়ে রেখেছিল। কারন বুঝতে পারছ? চেয়ে দেখ, তার মাথায় কোন চুল নেই। পেছনের কয়েকটা চুল লম্বা করে সামনের দিকে পেচিয়ে কপালটা ঢেকে রাখে। বিয়ে সময় কেউ যাতে সেই চুলে হাত না দিতে পারে সেই জন্য দুজন গার্ড ছিল দু'পাশে। তবে কোন দুর্ঘটনা হয়নি। সহি সালামতে শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র চুলের ফ্যাশন ছাড়া অন্য কিছুই জাহাঙ্গীর গোপন করেনি বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। যেমন অনেকেই নেয়। বিশেষ করে বয়স তো আর লুকানো যাবেনা। চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। হয় বিয়ে হোক বা না হোক। প্রবাস জীবনের এটাই বড় একটা ট্রাডেজি। সময় মত বিয়ে করা যায়না। বিয়ের বয়স কখন যে পেরিযে যায় তা অনেকেই টের পায় না। যখন টের পায় তখন অনেক দেরী হয়ে যায়। জাহাঙ্গীরেরও তাই হয়েছে। বেচারা বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই ইমিগ্রেশনের চিঠি পেয়েছে, 'তোমার

দরখাস্ত সন্দেহজনক বলে তোমাকে দেয়া অস্থায়ী গ্রীন কার্ড বাতিল বলে গণ্য হবে।' তাতে জাহাঙ্গীরের তেমন মাথা ব্যথা নেই। তার যা দরকার তা নিয়ে এসেছে। এই শান্তি। জাহাঙ্গীরের মত এমন সুখী দম্পতি খুব একটা দেখা যায় না। ভাবী সোসিওলজিতে এম এ। কিন্তু তার কোন দেমাক নেই। সাধারণ জীবন যাপন পছন্দ করেন। আমি প্রায়ই তার বাসায় যাই শুধু চিতই পিঠা খাবার জন্য। এমন সুন্দর চিতই পিঠা বানায় যে, একটা হবার আগেই আগেরটা খেয়ে বসে থাকি। চলতে থাকে অপেক্ষা। আমার এ অবস্থা দেখে ভাবী শেষ পযন্ত দুটো খোলার ব্যবস্থা করেছে। জাহাঙ্গীরের প্রতি তার হৃদয়ের যে টান দেখেছি তাতে মনে হয় জাহাঙ্গীরের সাথে জাহান্নামে যেতেও রাজী আছে।

পারুল ভাবী হেসে বলল, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!

আর ইনি হলেন বাতেন। একটা সাবওয়ে ষ্টোরের মালিক। ৩৪ষ্ট্রিটের সাবওয়েতে দেখবে একটা ক্যান্ডি ষ্টোর। তিনি ওটা লিজে নিয়েছেন। অবশ্য পাঁচ বছরের জন্য শুধু। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে নিতে পেরেছে এই স্টোর। এসব সাবওয়ের ষ্টোরগুলো ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীদের হাতেই থাকে। সাবওয়ে থেকে অকশানে ডাকতে হয়। ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীদের সাথে কেউ পেরে উঠেনা। তারা প্রায় সব ক্যান্ডিষ্টোরের মালিক। সিটি থেকে ডেকে নিয়ে তারা বিক্রি করে অথবা ভাড়া অথবা লিজ দেয়। বাতেন এটা নিয়েছে লিজে পাঁচ বছরের জন্য। নিজে ব্যবসা করতে গেলে গরুর মত খাটতে হয়। সামান্য সময় বের করা যায়না। তাই সে অনেকটা সমাজের বাইরে। কারন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত হতে পারেনা। আজকে সময় করতে পেরেছে আর একজনকে বসিয়ে দিয়ে। ভাবী এবং বাতেন পালা করে কাজ করে। ভালই আয় হয়।

একে একে আরও দুতিনজন এসে পৌছলে নিখিল এল সকলের পরে। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে পর বাহার বলল, আজকে তোমাদের একটা সুখবর দিচ্ছি। সেটা হল আমার ছেলে সাগর একটা টপক্লাশ ইউনিভার্সিটি রেন্সেলিয়ার থেকে অফার পেয়েছে। চার বছরের জন্য ফুল স্কলারশীপ। ডর্মে থাকতে হবে। এই ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র হাই স্কুলের টপ ক্লাশ ছাত্ররাই সুযোগ পায়। আমেরিকার প্রায় সব স্টেটের হাই স্কুলগুলো এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। বিশেষ করে নিউইয়র্ক সিটির চারটা স্পেশালাইজড স্কুলের ছাত্রদের দিকেই এসব ইউনিভার্সিটিগুলো নজর রাখে। আর এই চারটা স্কুলে ভর্তি হবার জন্য সমস্ত নগরীতে প্রতিযোগিতা হয়। যারা সেই প্রতিযোগিতায় ক্রমিক স্থান দখল করতে পারবে তারাই এই চারটা স্কুলে সুযোগ পাবে। আর এই চারটা স্কুলের একটাতে সুযোগ পাওয়া মানে নিশ্চিন্ত হওয়া সে ছাত্রের ভবিষ্যত উজ্জল। সাগর যেহেতু সেই স্পেশালাইজড স্কুলের একটা লা'গর্ডিয়া স্কুলের ছাত্র এবং স্বর্ণপদক পেয়েছে তাই তাকে আগেভাগেই অফার দিয়েছে। লা'গর্ডিয়া বিশ্বে একমাত্র স্কুল যেখানে ছাত্রকে তার নির্ধারিত বিষয়ে স্পেসালাইজ করে দেয়। আরও দুটো ইউনিভার্সিটিও তাকে অফার দিয়েছে। সে রেন্সেলিয়ার ইউনিভার্সিটিকে পছন্দ করেছে। সেপ্টেম্বর থেকে চার বছরের জন্য ছেলেকে যেতে হবে ডর্মে।

এ খবরে সকলেই খুশিতে আত্মহারা। সকলেই ভাবছে যেন এ তাদেরই ছেলে, কৃতিত্বের ভাগী সকলে সমভাবে। নতুন করে সাগরকে আবার সকলে আর একবার দেখল। এগিয়ে গিয়ে কথা বলল। নিখিল বলল, ছেলের কৃতিত্বের সব পাওনা ভাবীর। তুই কি কোনদিন ছেলেমেয়ের পড়ালেখা দেখেছিস? আড্ডা দিয়েই সময় পার করিস।

ভাবী দেখাশোনা না করলে ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করত না। ধন্যবাদ ভাবীর পাওনা।

আমার মনে হয় আমারও কিছু দান আছে। কারণ এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে যদি কোন ছাত্র তার হোম ওয়ার্ক ঠিকভাবে না করে তা হলে সে পরিক্ষায় ভাল করবে না। প্রতিদিন হোম ওয়ার্ক ঠিকভাবে করলে ছাত্র খারাপ হবার কোন সুযোগ নেই। আর আমি প্রতিদিন একবার অন্তত সাগরের হোম ওয়ার্কটা দেখি। সাগরকে তারা রিসিপশান দিচ্ছে একটা ফাইভ ষ্টার হোটেলে। সেখানে আমাকে এবং তোর ভাবীকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় আমারও দান আছে।

ফাইভ ষ্টার হোটেলে রিসিপশন!

হ্যা, শুধু তাকে একা নয়। আরও যারা অফার পেয়েছে মনে হয় সবাইকে এক সাথেই দিচ্ছে।

যাক, ভাল খবর শুনলে ভাল লাগে। নিখিল বলল। এই বিদেশে বাঙালী ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় খুবই ভাল করছে। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই টপ রেজাল্ট করেছে। বাঙালী ছেলেমেয়েদের ভাল রেজাল্ট করার বিনিময়ে বাংলা একটা সাবজেক্ট পাঠ্য বিষয়ে যোগ হচ্ছে আগামী সে স্বর থেকে। এ শুধু বাঙালী সন্তানের কৃতিত্বের জন্য। আমেরিকাতে বাংলা বিষয় পাঠ্য হওয়া সোজা কথা নয়!

বাহার বলল, এষ্টোরিয়াতে অনেক ভাল ভাল ছেলেমেয়ে আছে, স্কুল কলেজে অনেক সুনাম করছে। এই এলাকার চেয়ে এষ্টোরিয়াতে অনেক বেশি বাঙালীর বাস। কিন্তু সেখানে কিছু কিছু ছেলেমেয়ে অনেক দুর্নামও কামিয়েছে। সেখানে কিছু ছেলেমেয়ে হাই স্কুল শেষ করেনি। তারা কাউলাদের মত কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে। দেখনি, কয়দিন আগে পত্রিকায় কি লিখেছে? কিছু মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কয়েকটা বখাটে ছেলের কারণে। সে ছেলেগুলো স্কুলে যায়না। নাকে, কানে নোলকজাতীয় কি পড়ে। মাথার চুল কায়দা করে বিভিন্ন ষ্টাইলে ছাটা। মাল্টিকালার করা থাকে। কারও মাথায় আবার মেয়েদের মত ক্লিপ বা ফিতা। একবারে অদ্ভুত স্টাইল। দিন রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, যে বাসায় উপযুক্ত মেয়ে আছে সে বাসার সামনে বেশী ঘুর ঘুর করে, শিষ দেয়, বাজে মন্তব্য করে। মেয়েদের অভিভাবকরা প্রথমে ছেলেদের মাতাপিতাকে ব্যাপারটা জানিয়ে অভিযোগ করেন। কারণ সবাই পরিচিত। পরে ছেলেদের মাতাপিতা বলে দিয়েছে যে, তাদের হাতের বাইরে চলে গেছে তাদের সন্তান। তারপরই পুলিশে রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছে। দুজনকে এরেষ্ট করার পর এখন অনেকটা কম। তবে সেই ছেলেগুলো থেকে সকলেই সাবধান হয়ে গেছে। তাদের মাতাপিতা সকল প্রকার চেষ্টা করেও কথা শোনাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা সকলেই আঠারোর্ধ। অভিভাবকের অধীনে নেই। তারা স্বাধীন। এটাই এদেশের আইন। আঠার হলেই সাবালক। সে তার নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে। অভিভাবক হয়ে যায় অসহায়। নিজের চোখের সামনে নিজের সন্তান শেষ হয়ে যাচ্ছে, মারিজুয়ানা থেকে শুরু করে সব রকমের খারাপ কাজ করে যাচ্ছে। কোন শাসন করার অধিকার নেই। আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, কথা দিয়ে বুঝিয়ে যদি কোনরকমে কথায় আনতে পার তাহলেই সম্ভব। কোন ধমক দিয়ে নয়। চড়-থাপ্পড়ের কোন প্রশ্নই আসেনা।

ধমক দিলে কি হবে বাহার ভাই? আনিস জিজ্ঞেস করল।

আমি উত্তর দিচ্ছি, বলে একজন এসে সামনে দাঁড়াল। দরজা খোলাই ছিল। কখন যে ঢুকল কেউ খেয়াল করেনি। ময়লা কাপড়চোপড়, সার্টের হাত গোটানো। হাতের এখানে সেখানে অনেক দাগ। কালো কালো। মুখে বসন্তের দাগ, কাচাঁপাকা চুল ছোট করে ছাটা। বয়স চল্লিশের উপর।

বলল, ধমক দিলে পরিস্থতির সৃষ্টি হয়, সেই পরিস্থিতি বাধ্য করে বেতিয়ে চামড়া উঠিয়ে ফেলার। তা না করে নিজকে সংযত রেখে শুধু চড় দিলে কি হয় সেটা আমি জানি। বাইরের কেউ জানেনা। আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি লজ্জায়। আমার দশ বছরের ছেলেকে একটা থাপ্পড় দিয়েছিলাম। সে ৯১১ কল করে দিয়েছিল। দশ মিনিটের মাঝেই পুলিশ এসে হাজির। মানুষ জানাজানির ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি তাদের সাথে রওয়ানা দিই কোন কথা না বাড়িয়ে। থানায় গিয়ে আমি তাদের বুঝাতে চেষ্টা করি যে, আমার ছেলে লেখাপড়া না করে শুধু টিভি দেখে, সে তার হোম ওয়ার্কও করেনা। তাই তাকে শাসন করেছি। আগে পড়া শেষ কর তারপর টিভি দেখ। সে আমার কথা তো শুনেইনি বরং বেয়াদবি করেছে। বলেছে, তুমি কিচ্ছু জান না। তাই তাকে শাসন করা আমার কর্তব্য বলে একটা চড় দিয়েছি।

তোমার ছেলে হলেও তুমি তাকে চড় দিতে পারনা। বড়জোড় তাকে বলতে পার পড়া শেষ করার জন্য। চড় দেবার অধিকার তোমার নেই। এটা চাইল্ড এবিউজ। এই চাইল্ড এবিউজের অভিযোগে তোমাকে গ্রেফতার করা হল।

বল কি! আমার ছেলেকে আমি শাসন না করলে কে করবে? সে কিভাবে মানুষ হবে? এটা আমাদের নিয়ম, সামাজিক অধিকার!

এটা তোমার ইন্ডিয়া নয় যে তুমি তোমার ছেলেকে অত্যাচার আর মারধোর করবে! এটা নাগরিক অধিকার ভোগ করার দেশ। তোমার ছেলেরও কিছু অধিকার এবং স্বাধীনতা আছে। সে হোক নাবালক বা সাবালক। তুমি তার অধিকার ক্ষুন্ন করেছ! তার উপর অত্যাচার করেছ! এর জন্য তোমার শাস্তি হবে। তোমার যা বলার হাকিমের কাছে বলো। আমাদের করার কিছু নেই।

তাদের বিগ বসকে বললাম যে, সন্তান শাসন করার অধিকার আমাদের দেশের আইনে অনুমোদন করে। তোমাদের দেশের আইন আমি জানিনা। জানতেও চাইনা। আমি চাই আমার সন্তান কিভাবে মানুষ হবে সে আইন। সন্তান শাসন করার জন্য, সে শাসন যেভাবেই হোক, মৌখিক বা দৈহিক প্রহার, কোনটার জন্যই কোন অভিযোগ উত্থাপন করার রেওয়াজ আমাদের দেশের আইনে অনুমোদন করেনা। সেই মোতাবেক, আমাদের সহস্র বৎসরের অঘোষিত আইন অনুযায়ী আমি আমার ছেলেকে শাসন করেছি। তাতে তোমাদের আইনে কি শাস্তি হবে তা নিয়ে আমি ভাবিনা। এসব শোনার পর হাকিম বুঝতে পারল আমাদের দেশের আইনের বাইরের আইন যা এদেশের আইনে নেই।

শেষ পর্যন্ত বন্ডসই দিয়ে ছাড়া পেয়েছি। লিখতে হল আমি আর কোনদিন এধরনের শাসন করার চেষ্টা করবনা। এর পর থেকে ছেলেমেয়েদের সাথে হিসেব করে কথা বলি। এই বলে সে থামল।

বাহার জিজ্ঞেস করল, তুমি এত দেরী করলে কেন অজয়। এই হল আমাদের অজয়দা। কাজ করে একটা বেকারীতে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে তার কাজের চিহ্ন। ভোর চারটা থেকে শুরু করে, শেষ করে এগারটা বারটার দিকে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখ, পোড়া দাগ। চুলার ভেতর রুটি আনতে নিতে খুব সাবধানে থেকেও হাত পুড়ে যায়। হাতে

দেখ কত দাগ। অবশ্য এই দাগ চোখে পড়েনা যখন ডলার হাতে আসে। সাত আট ঘন্টা কাজ করে দেড়শ ডলারের মত পায় দৈনিক। বিকালটা ফ্রি। কিন্তু তোমার এত বড় ঘটনা হয়ে গেল কোনদিন বলনি তো! কবে হয়েছিল?

প্রায় দু বছর। বললে কি হতো? কারও কোন সাহায্য করার সুযোগ নেই। এটা জঘণ্য আইন! আমি ঘৃণা করি এ ধরনের আইনকে।

নিখিল বলল, আরে আমিও তো অনেকটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। স্কুলের পড়া নিয়ে। ৪র্থ শ্রেনীতেই ওরা সেক্স শেখায়। আমি আমার মেয়েকে সে ক্লাশে দিতে চাইনি। তাতে স্কুলের টিচার ক্ষেপে গেল। এটা নাকি বাধ্যতামূলক। শিখতেই হবে। এদেশের প্রত্যেকটা বাচ্চা সেক্স সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখে। আট দশ বছরের বাচ্চারা সব জানে। কিভাবে কনডম ব্যবহার করতে হয়, কেন করতে হয় ইত্যাদি অনেক কিছু যা আমরা অনেকেই হয়ত এত কিছু জানি না। কিন্তু উপায় নেই। এদেশে থাকতে হলে শিখতে দিতেই হবে।

না শিখলেও অসুবিধে আছে, বাহার বলল। আমরা যখন সৌদি আরব থেকে এখানে আসি তখন সাগর অষ্টম শ্রেনীতে ভর্তি হয়। সৌদি আরবে যদিও ওরা ব্রিটিশ স্কুলে পড়ত সেখানে সেক্স শেখানো হতনা বা শেখানোর নিয়ম নেই। এখানে স্কুলে ভর্তি হয়ে কয়েকদিন ক্লাশে গিয়ে সাগর বুঝতে পারল এখানে অনেক কিছুই নতুন। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে, আব্বু, মেয়েদের বুকে উচুঁ ওগুলো কি? এ ধরনের প্রশ্নে তোমরা কি উত্তর দিতে? প্রথমে আমি ঘাবড়ে যাই, কি উত্তর দেব। মুহূর্তে উত্তর দিই, ওহ্ হো, এটা বুঝলেনা? একদম সোজা! এই ধর, একটা গরু বাচ্চা দেয়, বাচ্চাতো আর তখনি কোন শক্ত খাবার খেতে পারেনা। তখন তার দুধ খেতে হয়। এমনি সব বাচ্চারাই দুধ খেতে চায়। সে দুধ আসে মায়ের বুক থেকে। মানুষের বাচ্চা হলেও দুধ খেতে হয়। আর সে দুধ আসে বুকের সেই উচুঁ যায়গা থেকে। আমার জন্মের পর আমিও আমার মায়ের বুক থেকে দুধ খেয়েছি, তুমিও তোমার মায়ের বুক থেকে দুধ খেয়েছ। এটা হল দুধ পাবার উৎস, আমরা বলি দুধ।

এ পর্যন্ত বলে ছেলেকে তো একটা বুঝ দিলাম, মনে মনে বললাম, বেটা তুই বড় হয়ে বাকীটা বুঝে নিস। পরের দিন স্কুলে গিয়ে তার শিক্ষককে বললাম কথাটা। সে মহিলা হেসে ফেলল। বলল, ও, বুঝেছি। সে তো আর আমাদের সেই ক্লাশ পায়নি। তাকে আলাদা একটা ক্লাশ করাতে হবে। তুমি চিন্তা করোনা। এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন আর হবেনা তুমি। আমরা দেখব।

তাই বলি, এসব ক্লাশেরও প্রয়োজন আছে। তবে আর একটু পরের ক্লাশ থেকে শিখালে ভাল হয় আমাদের জন্য। আজ হোক, কাল হোক, শিখতে তো হবেই। অথবা শিখে ফেলবেই।

-২০-

আমান নয়টার আগে ঘুম থেকে উঠেনা। আনিসের ঘুম ভেঙ্গে যায় তার আগেই। এখন খাবারের জন্য আমানের উপর নির্ভর করতে হয়না। রান্নার অনেকগুলো কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে আনিস। ঘুম থেকে উঠে পাউরুটি আর ডিম দিয়ে নাস্তা শেষ করেছে। আমানের জন্য তৈরি করেছে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। বাজে সাড়ে আটটা।

টেলিফোন উঠাতেই ঝরনার কলতান ভেসে এল, আজ কি করছেন?

লতা ভাবী?এখনও ঠিক করিনি কি করব।

তাহলে চলে আসুন এখানে। দশটার সময় সুরি আসবে আমার এখানে। আপনার কথা বলেছি। আমি এখন ট্রেড ফেয়ারের সামনে আছি। বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে এসেছি। এখন আর কোন কাজ নেই। আবার সেই তিনটায় যাব, তখন ছুটি হবে। আমি অপেক্ষা করছি। এখনি চলে আসুন, বলেই আর কিছু বলার অপেক্ষা না করে ফোন রেখে দিল।

আনিস ট্রেড ফেয়ার চেনে। একটা সুপার মার্কেট। আমানের সাথে কয়েকবার গেছে বাজার করার জন্য। বাসা থেকে দশ মিনিটের পথ। আনিস প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় আমান বিছানায় শুয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করল, কই যাবি এখন?

লতা ভাবী অপেক্ষা করছে ট্রেড ফেয়ারের সামনে। যেতে বলল।

আমি রান্না করে তবে কাজে যাব। তুই ঘুরে আয়।

ট্রেড ফেয়ারের সামনে যেতেই লতা ভাবী বলল, চলুন মার্কেটের ভেতরে যাই। কিছু কেনা কাটা আছে টুকটাক।

টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে কাউন্টারে এসে দুজনে দাড়াল। লতা কাউন্টারের মহিলার সাথে বাংলায় কথা বলছে। আনিসকে পরিচয় করিয়ে দিল। ইনি রিনা ভাবী। এখানে কাজ করেন অনেক দিন।

আমি তো মাঝে মাঝে এখানে আসি। দেখিনি তো!

আমার শিফট বদল হয়, কোনদিন সকালে কোনদিন বিকেলে। আপনি নিশ্চয়ই আমার শিফটের বাইরে এসেছেন।

হ্যা, বিকেলে এসেছিলাম।

সেখান থেকে বেরিয়ে হাটতে লাগল লতার বাসার দিকে।

বাসায় ঢুকেই আনিসকে বলল, আপনি লিভিং রুমে বসুন। টেলিভিশন চলছে, এখন ভাল একটা ছবি হচ্ছে। আপনি দেখুন। আমি চায়ের পানিটা বসিয়ে আসি।

কয়েক মিনিটের মাঝেই চা, দু পিস কেক আর বিস্কুট একটা ট্রেতে করে নিয়ে আনিসের পাশে এসে বসল। বলল, এবার বলুন আপনার প্ল্যানটা কি? কি করবেন ভাবছেন?

এখন তো আর কোন কিছুই ভাবতে পারছিনা। স্বপ্ন তো ছিল অনেক। এখানে আসার পর সব হিসাবে গড়মিল হয়ে গেছে। কোন কিছুই মিলছেনা।

কি ছিল আপনার স্বপ্ন?

প্রথম স্বপ্ন ছিল চাচার কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর আমি হব হর্তা কর্তা, আমার অধীনে অনেক কর্মচারী থাকবে, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকবে ইত্যাদি কত কল্পনা ছিল! চাচার কোম্পানী দেখে আমি একবারে হতাশ। চাকরির যে অবস্থা দেখছি, আমি তো কোন কাজেরই নই। কোন চাকরীর উপযুক্ত নই। অড জব ছাড়া কোন কাজই তো পাওয়া যাবেনা।

হ্যাঁ, এখানে শতকরা ৮০জন বাঙালি অড জব করে। বাকি বিশ জনের মাঝে ১৫ ভাগ অড জব না করলেও খুব একটা ভাল পজিশনে নেই। ৫ ভাগ আছে যারা এখানে এসে লেখাপড়া করে ভাল ভাল চাকরি করছে। আপনি লেখাপড়া শুরু করুন না কেন? দু'চার বছর লেখাপড়া করলে এদেশে ভাল চাকরি মিলবে। প্রথম কষ্ট করলে বাকী জীবনটা তো সুখে কাটবে। আপনার তো পিছুটানও নেই। নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করতে পারেন।

এটাইতো মুস্কিল। লেখাপড়া করতে ইচ্ছে হয়না। লেখাপড়ার নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে।

লেখাপড়া না করলে অড জবই করতে হবে এবং সারাজীবনই গায়ে জ্বর থাকবে। সে জ্বর আর ছাড়বেনা। ভেবে দেখুন, তিন চার বছর জ্বর নিয়ে থাকবেন না কি সারা জীবন জ্বর নিয়ে বেচে থাকবেন।

দেখি কি করা যায়!

এতে দেখাদেখির কি আছে? সোজা পথ। লেখা পড়ার পর সবই দেখা যাবে। এখন শুরু করে দেয়া মাত্র। লেখা পড়া শেষ হলে পথ এমনিতেই খুলে যাবে। এখন কি দেখবেন? বাংলা ফিল্ম দেখবেন? না কি অন্য কোন ফিল্ম? নাকি টিভিতেই কিছু দেখবেন?

টিভিতে যা চলছিল সেটাই চলতে বলল আনিস।

লতা বলল, সেই মেয়েটা, যার কথা আপনাকে বলছিলাম দেখাব বলে, আজ আসবে। সকালে একটা মাত্র ক্লাশ আজ। সারাদিন থাকবে। ওর নাম সুরি। আসল নাম সুরাইয়া। কলেজে এত বড় নাম নাকি কেউ বলেনা। তাই সুরাইয়া হয়ে গেছে সুরি। যেমন আর সকলের হয়। ও পড়ে লা'গার্ডিয়া কলেজে। বাবা মা আর একটা ছোট ভাই আছে এখানে। অনেকদিন যাবত আছে এ দেশে। দেখতে খুবই সুন্দরী। আপনার পছন্দ হবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

আগে তো দেখি। শুধু আমার পছন্দ হলেই তো চলবেনা, তারও তো পছন্দ আছে। কে কাকে পছন্দ করবে কে জানে!

পছন্দ না হবার কোন কারণ আমি দেখছিনা। সুরির পরিবারের সাথে আমাদের খুবই হৃদ্যতা। যখন তখন আসা যাওয়া আছে। ওর বাবা আর সৈয়দ সাহেব বন্ধু। প্রথমে এক সাথে কাজ করত। গ্রীন কার্ড হয়ে গেছে অনেক আগে। কি একটা কোর্স করে এখন চাকরি করে। তাদের দেশের বাড়ী ময়মনসিংহ। তার মাকে একটু আভাস দিয়েছি মাত্র। ওর আসার সময় হয়ে গেছে।

আর ঠিক তখনি বেল বেজে উঠল। লতা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আনিস দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে টিভি দেখছে। লতা আগে আগে, পেছনে সুরি এসে সালাম দিতেই আনিস মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল। লতা পরিচয় করিয়ে দিল। পাশে আর একটা সোফায় বসল সুরি। আগাগোড়া পুরুষের পোষাক, কথাটা ভুল বলা হল। যে পোষাক আমাদের দেশে শুধু পুরুষরাই পরে। প্যান্ট সার্ট। সার্টেরও আবার রকম আছে। এ সার্ট হাফ হাতা ফিনফিনে। একটু সামান্য বাতাসে ঝলমল করে উঠে। মাথার চুল বাঙালি ফ্যাশনে ছাটা, বোধ হয় বিউটি পারলার থেকে। ঘন কোকড়ানো খোলা চুল ঘাড় পর্যন্ত এসে থমকে গেছে। মুখে সুক্ষ প্রসাধণী। ঠোটে হালকা রং। গায়ের রং উজ্জল শ্যামলা। সবকিছু মিলে একজন সুশ্রী মহিলা।

সোফায় বসেই লতাকে আদেশ করল, খালাম্মা খেতে দিন কিছু। সাথে চা হলে ভাল হয়।

যদিও সুরি লতার বয়সের কাছাকাছি কিন্তু খালাম্মা বলেই ডাকে। কারণ সুরির মা'কে আপা বলে ডাকে লতা।

আমরা তো চা এইমাত্র শেষ করলাম। এক মিনিট, তোমাকেও দিচ্ছি। বলে ভেতরে চলে গেল লতা।

সুরি আনিসকে আড়চোখে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কত দিন হল এদেশে এসেছেন?

এই তো মাস দুয়েক হল।

কিছু করছেন?

না, এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ঘুরে বেড়াচ্ছেন? খুব মজা তো! এদেশে আবার ঘুরে বেড়াবার সময় আছে নাকি? তাহলে আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন? বেড়ানো শেষ হলে চলে যাবেন?

আরে না, ও চলে যাবে কেন? বলে লতা চা নিয়ে হাজির হল। বলল, ওর চাচী বলেছে কিছুদিন ঘুরে ফিরে দেখতে। তারপর সিদ্বান্ত নিতে সে কি করবে।

ও তাই বলুন, উনি টেম্পরারী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আনিস মনে মনে বলল, এ যে দেখছি দারোগা! কথা কেমন চট্যাস চট্যাস করে বলে! কাকে কে বাজাচ্ছে! কেন যে সে সুরির সাথে ফ্রি হতে পারছেনা, তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছেনা! সুরি তো ফ্রি কথা বলছে! সাহস সঞ্চয় করতে হবে! কথা বলতে হবে। তার কাছে প্রমাণ করতে হবে সেও স্মার্ট, লেখাপড়া জানে। সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসে কি পড়েন?

আমি লা'গার্ডিয়া কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে আছি। মেজর করছি বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন।

এখানে কত বছর আছেন?

দশ বছর হল।

কলেজে কোন দেশের ছাত্রছাত্রী বেশি?

আর বলেন না, বাসা কাছে বলে এই কলেজে ভর্তি হলাম। গিয়ে দেখি বাংলাদেশের ছাত্র ভর্তি। মনে হল যেন বাংলাদেশের কোন একটা কলেজে আছি। অর্ধেক ছাত্র বাঙালী। বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ভর্তি হয়ে এসেছে, আর স্থানীয় ছাত্রও কিছু আছে। বিদেশী ছাত্র এই কলেজে সহজভাবে ভর্তি হতে পারে। তাদের নিয়ম কানুন খুব শিথিল। এ ধরণের আরও কয়েকটা কলেজ আছে,সেখানেও শুনেছি যথেষ্ট বাঙালী ছাত্র আছে। এ বছর তো ছাত্র ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট একজন বাঙালী ছাত্র। বাঙালীরাই এখন লিড করছে। কলেজে গেলে আমেরিকায় আছি বলে মনে হয়না।

তাহলে তো বেশ মজা। এ দেশটাকে নিজের দেশ করে নিয়েছেন।

একদিক দিয়ে মন্দ না। একে অপরকে বেশ সহযোগিতা এবং সাহায্য করে, আবার বাঙালির স্বভাব প্রকাশ করে ঝগড়াও করে। মিটেও যায়। রেজাল্ট অন্য দেশির তুলনায় বাঙালিরা ভাল করে। দুএকজন আছে কিছুদিন পরই ঝরে পড়ে। তারা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আসেনি, এদেশে থাকতে এসেছে। লেখাপড়ার নামে। এসেই কাজে লেগে গেছে। সারাজীবন অড জব করবে।

লতা বলল, তোমরা কথা বল, আমি আজ শর্টকাট রান্নাটা শেষ করে ফেলি। বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সুরি জিজ্ঞেস করল, আপনি বাংলাদেশ থেকে কি লেখাপড়া করে এসেছেন?

আমি ইংলিশে এম, এ করে এসেছি।

এদেশে এর কোন দাম নেই। শুধু কলেজে ভর্তি হবার জন্য এই ডিগ্রীটার প্রয়োজন ক্রেডিট গণনার জন্য। আমাদের দেশের এই ডিগ্রী এদেশে আন্ডারগ্রাজুয়েট বা তার সমমানের। কিন্তু চাকরি বাকরির ব্যাপারে এসব ডিগ্রী কাজে লাগেনা। এখানে চাই প্রফেশনাল ডিগ্রী। আপনি শুধু হাই স্কুল পাশ করে যদি কোন টেকনিক্যাল বা প্রফেশনাল ডিগ্রী নেন তাহলে আপনার চাকরি আছে। যেমন ধরুন এখন চলছে কম্পিউটারের যুগ। স্কুল পাশ করে দু বছর বা চার বছরের কোর্স শেষ করলে কাজ মিলবে। মোট কথা এদেশের একটা ডিগ্রী থাকতেই হবে

যদি কাজ করতে চান। বাংলাদেশ থেকে পি এইচ ডি করে এলেও আপনার কোন কাজ এখানে নেই। হ্যা, কাজ আছে এই লেখাপড়ার ধারে কাছেও না এমন ধরণের কাজ পেতে পারেন। তার মানে আপনার এত বছরের পড়াশোনা মাঠে মারা গেল।

আপনি কি পড়বেন এবং কতটুকু পড়ার ইচ্ছে?

আমি এখন বিবিএ করব, তারপর এমবিএ করে একটা চাকরি করব। তারপর পিএইচডি করার ইচ্ছে। যদিও এমবিএ কম্পিউটার জগতের সাথে পাল্লা দিতে পারবেনা, তবু আমি এমবিএ করব। কম্পিউটার নিয়ে চার বছর পড়াশোনা করলে ষাট হাজার ডলার বা তার বেশি বেতন শুরু হয়। কিন্তু এমবিএ শুরু হয় ৪৫/৫০ হাজার থেকে। কম্পিউটার আমার কাছে ভাল লাগেনা। যা ভাল লাগেনা তা নিয়ে জোর করে পড়তে গেলে রেজাল্ট খারাপ হয়। রেজাল্ট খারাপ হলে ভাল চাকরি পাওয়া যায়না। বাংলাদেশ থেকে লেখাপড়া করে এখানে এসে চার বছরের কোর্স করে ৭০/৮০ হাজারের চাকরি করে এমন ভুরি ভুরি ছেলে আছে এখানে।

চার বছর পড়াশোনার জন্য খরচ কেমন লাগে মানে বেতন ইত্যাদি মিলে কি খরচ হয়?

খরচ প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০ হাজার লাগে। ইচ্ছে থাকলে এই খরচ এদেশে জোগাড় করা কিছুই না। এই যে বাংলাদেশ থেকে ছেলেরা এসেছে তারা তো একবারই কিছু টাকা নিয়ে এসেছে। এখন পার্টটাইম কাজ করে খরচ জোগায়। আর যারা এদেশের নাগরিক বা লিগেল রেসিডেন্ট তারা তো পড়ার জন্য লোন পায়। সে লোন যতদিন লেখাপড়া শেষ না হবে তত দিন ফেরত দিতে হয়না। ইন্টারেষ্ট রেইট খুব কম। তারপর চাকরি হলে আস্তে আস্তে দিলেই চলে। কোন ছেলে মেয়েই মা বাপের গাটের পয়সা খরচ করে লেখাপড়া করেনা। হয় কাজ করে না হয় লোন নিয়ে লেখাপড়া করে।

আপনি কিভাবে খরচ জোগাড় করেন? আনিস জিজ্ঞেস করল।

আমি টিউশান ফি দিচ্ছি স্টুডেন্ট লোন নিয়ে।

এমন সময় লতা ডাক দিল, সুরি, আমাকে একটু হেলপ কর। খাবারগুলো টেবিলে নিয়ে যাও।

সুরি উঠে গেল।

আনিস ভাবতে লাগল, এ মেয়ে তো অনেক কিছু জানে! এত চটপটে কথা বলে! এত খবর রাখে! তার সাথে কথায় পেরে উঠবেনা সে। পরীক্ষা নিতে এসেছে সে। আনিস বোধ হয় ফেল করেছে।

টেবিলে খাবার সাজানো হলে লতা বলল, এবার বসে পড়। বেশি কিছু করি নাই। চিকেন বিরিয়ানি আর গরুর মাংশ। আস, শুরু করে দাও। সেল্‌ফ হেলপ।

খাওয়া শেষ হতেই আড়াইটা বেজে গেল। লতা বলল, এ বেলাটা কি বাইরে ঘুরতে যাবে তোমরা?

না, আমাকে বাসায় যেতে হবে। অনেক হোম ওয়ার্ক। মা'কে বলে এসেছি বিকেলেই ফিরব। পরে আর একদিন দেখা যাবে।

আনিস বলল, আমাকেও উঠতে হবে।

আমি তো বাচ্চা আনতে স্কুলে যাব এখন। তোমরা বস, গল্প কর। আধ ঘন্টার মধ্যেই চলে আসব।

সুরি বলল, চলুন আপনার সাথেই বেরিয়ে যাই। আর একদিন আসব সারাদিন থাকব।

তিনজনেই ঘর থেকে বের হল। আনিস চলে গেল ডান দিকে তার বাসার দিকে। আজ আসি, আবার দেখা হবে বলে।

সুরি আর লতা চলল স্কুলের দিকে। স্কুলের পাশেই সাবওয়ে। সুরি চলে যাবে সাবওয়েতে।

আনিস চোখের আড়াল হতেই লতা জিজ্ঞেস করল, আনিসকে তোমার কি মনে হল? খুব ভাল ছেলে।

ভাল না ছাই! চেহারাটা দেখতে হিরোর মত, আর কি আছে তার? সে কোন কাজে লাগবে এদেশে? চেহারা দিয়ে জীবন চলেনা। জীবনযুদ্ধে চাই মোক্ষম অস্ত্র। সে অস্ত্র হচ্ছে ডলার। ডলার না থাকলে যুদ্ধ করবে কি দিয়ে? ডলার পেতে হলে লেখাপড়া করতে হবে। সে একটা মাকাল ফল। লেখাপড়া করতে চায়না। পরের উপর নির্ভর করে চলতে চায়। চাচী আছে বলেই কি সে আরাম করে তার টাকা নষ্ট করবে? তার চাচীর কারণে সে অকেজো হয়ে যাবে। কোন কাজই করবেনা। পরের দানের উপর নির্ভর না করে নিজে কিছু করুক। তাহলেই সে সুপুরুষ। কর্মঠ। এ একটা অকর্মন্য। ওকে দিয়ে কারও কিছু হবেনা। এই বলে সে সাবওয়ের পথ ধরে হাটতে লাগল।

-২১-

আনিসের কোন তাড়া নেই। সবকিছুতেই রিল্যাক্স। আমান কাজে চলে গেছে। শুয়ে শুয়ে ভাবছে আজ কোন একটা মিউজিয়ামে যাবে। এমন সময় দরজার কড়া নাড়ছে কে! আমানের কাছে তো চাবি আছে। পাশের রুমের কে থাকতে পারে এখন ভাবছে আনিস। জিজ্ঞেস করল, কে? ওপাশ থেকে ভেসে এল, আমি। খুলুন।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। আরে! ভাবী আপনি?

ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? ভেতরে আসলে অসুবিধা আছে?

না, না। চিনলেন কি করে?

একদম সোজা। আপনি বলেছিলেন কোণের একটা বাসা পরেই। নাম্বারও মনে আছে। সোজা চলে এলাম শান্তকে স্কুলে দিয়ে।

আসুন, ভেতরে আসুন। আমার কি সৌভাগ্য! বসুন বলে চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল এক গাদা ময়লা কাপড় চেয়ারের উপর। ঘরে একটাই চেয়ার। আর ছোট একটা টেবিল। আমানের পড়ার টেবিল। আনিস এখনও কিছু কিনেনি। এই ময়লা কাপড়গুলো চেয়ারে আছে আজ কয়েকদিন। তাড়াতাড়ি সরিয়ে নীচে রাখল। বলল, বসুন। কি খাবেন, চা না কফি?

তাহলে তো আপনাকে খাটতে হবে। আপনি যা খাবেন তাই চলবে। রান্নাঘর কোন দিকে? চলুন দেখি বলে লতা চলতে শুরু করল।

আনিস বলল, আপনি বসুন, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

রান্নাঘরটা দেখে নিই আগে, তারপর চা।

আনিস পেছন পেছন এগিয়ে গেল। রান্নাঘরে ঢুকে এক নজর দেখে নিল লতা। বলল, সবকিছু এমন এলোমেলো করে রেখেছেন! বেসিনের পাশে অনেকগুলো শিশি বোতল, কৌটা,ময়লা হাড়ি পাঁতিল, শেল্ফে জায়গা থাকা সত্ত্বেও সব নীচে নামানো। লতা কেটলিতে পানি বসিয়ে দিয়ে চুলা জ্বেলে দিল। কৌটাগুলো তাকে সাজিয়ে রাখল।

আনিস চিৎকার করছে, আপনার কিছু করতে হবেনা, আমিই করব সব। আপনি বসুন গিয়ে। কিন্তু আনিসের কোন কথাই যেন তার কানে যাচ্ছেনা। হাড়ি পাঁতিলগুলো পরিস্কার করে ঠিক জায়গায় রাখল। আনিসের হাত থেকে চায়ের পাতা নিল। চায়ের কাপ নিয়ে চা তৈরি

করে বলল, নিন। এবার টেবিলে নিয়ে যান। সেখানে বসে আরাম করে খাব।

চায়ের সাথে কিছু বিস্কুট নিয়ে আনিস রুমে এসে বসল। লতা চেয়ারে, আনিস বিছানার কোণে। আনিস বলল, কিছুই ঠিক করতে পারছি না। কি করব।

সবকিছু দেখে ধীরে সুস্থে চিন্তা করুন। অত তাড়া কিসের? আচ্ছা, আজ কি রান্না করবেন?

আমান কাল মাংশ এনেছে। আমি এখনও মাংশ রান্নায় পাকা হইনি। ভাবছি কি করব। আজ কলেজে যাব। ফিরে এসে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।

চলুন দেখি বলে লতা রান্নাঘরে চলে গেল। একটাই ফ্রিজ। ফ্রিজ খুলে দেখে কত রকমের জিনিষ। কিন্তু রান্না করার মত কিছুই নেই। আনিস পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। লতা বলল, আসুন, আমাকে হেলপ করুন। আজ আপনি আমার হেলপার। আমি আপনার রান্নাটা করে দিয়ে যাই। স্কুল ছুটি হবার আগেই শেষ হয়ে যাবে। মাংশ কোথায় বের করুন।

আপনার কষ্ট করতে হবেনা, আমিই করব। আসুন, ঘরে বসে গল্প করি।

যা বলছি তাই করুন না। মাংশটা বের করে দিন। চাউল কোথায়? মসলা কোন দিকে?

আনিস দেখল নাছোড় বান্দা। রান্না করেই ছাড়বে। ফ্রিজ থেকে মাংশ বের করে দিল। চাউলের বস্তা দেখিয়ে দিল। লতা শাড়ী কোমরে পেঁচিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেল। আনিসেকে বলল, আপনি আমার কাছাকাছি থাকুন। যখন যা লাগে এগিয়ে দেবেন।

লতা ঘরে ঢোকার পরই একটা সুবাসে বাতাসটা যেন নেচে উঠল। নাকি আনিসের মনের ভুল কে জানে! এখন এই রান্না ঘরে লতার পাশাপাশি থেকে তার নাকে যখন তখন একটা হালকা সুবাস জানান দিয়ে যাচ্ছে। ওটা কি চুলের গন্ধ? নাকি নারীর শরীরের চিরন্তন গন্ধ? আনিস ঠিক বুঝতে পারছেনা। কি সেটা। নাকি সেটা তার মনের একটা সাময়িক আকর্ষণ। আনিস ক্ষণে ক্ষণে আনমনা হয়ে যায়। লতা মাঝে মাঝে বলছে, এটা ধুয়ে দিন, ওটা কেটে দিন। এসব শিখতে হবে। বিয়ে করলে এমনি সাহায্য করতে হবে। এদেশে চাকরবাকর নেই। নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হবে। এখন থেকে ট্রেনিং নিতে থাকুন। এ যেন চড়ুই ভাতি খেলছে তারা। দু'জনে মিলে, জনহীন কোন অরণ্যে। ধীরে ধীরে লতার গায়ের গন্ধে বাতাস ভারি হচ্ছে, চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আনিস বাধ্য ছেলের মত আদেশ পালন করে যাচ্ছে। এক সময় মাংশের মসলার গন্ধে হঠাৎই বাতাসটা বদলে গেল। আকর্ষনীয় সুবাসটা আর নেই। এখন শুধুই মাংশের গন্ধ ম ম করছে। আনিসের মনে পড়ে গেল বাড়ীর কথা, মায়ের কথা। মা যখন মাংশ রান্না করত ঠিক এমনি গন্ধ চারদিক ছড়িয়ে যেত। গন্ধটা নাকে লাগলেই খুব ক্ষিধে পেত তার। মায়ের চেহারাটা ভেসে উঠল তার মানসচক্ষে। মা একা আর কতদিন থাকবে! অবশ্য তার এমন কোন অসুবিধে নেই। দেখাশোনা করার মানুষ আছে। প্রতিবেশি কালুর মা সর্বদা থাকে। মায়ের সব কাজকর্ম করে দেয়। কালু রিক্সা চালায়। সব বাজার সদাই করে দেয়। এদিক দিয়ে মা খুব ভালই আছে। চাচা একবারে বেশি করে টাকা পাঠিয়ে দেন। বছরখানেক চলে যায় দিব্বি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লতা বলল, আড়াইটা বেজে গেছে। স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। আমাকে যেতে হবে। মাংশ আর একটু সিদ্ধ হবে। আপনি

ঘড়ি দেখে ঠিক দশ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দেবেন। তারপর আরাম করে বসে খাবেন। এই বলে হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

আনিস একটা কথাও বলতে পারলনা। সে যেন অন্য কোন জগতে ছিল এতক্ষণ। লতা চলে যেতেই সে তার রুমে গেল। কি ফেলে গেল লতাভাবী! তার রুমে খোঁজে দেখল, না কিছুই ফেলে যায়নি। তার মনে হচ্ছে কি যেন ফেলে গেছে। আবার রান্নাঘরে ফিরে এল। নাহ্, কিছুই তো রেখে যায়নি এখানে! তার ঘর আর রান্নাঘরে কয়েকবার ছুটাছুটি করল আনিস। কিছুই খুঁজে পেলনা। কি রেখে গেল! কি ফেলে গেল! কিছুই দেখা গেলনা। কিন্তু কিছু একটা ফেলে গেছে নিশ্চয়ই! কিছুই না পেয়ে বিছানায় বসে ভাবতে লাগল আনিস। সে ভুলে গেছে আজ তার কলেজে যাবার কথা। মনে হল তার এখন সবচেয়ে বড় কাজ লতা ভাবীর জিনিষ খুঁজে বের করা। লতাভাবী কি ফেলে গেল? তার মন বলছে রান্নাঘরেই জিনিষটা ফেলে গেছে। আবার রান্নাঘরে গেল। অনেকক্ষন দাড়িয়ে ভাবল। চোখে দেখার মত কিছু ফেলে গেল কি! নাকি মনের কিছু! নাকি সংসারের আর কিছু যা চোখে দেখা যায়না! রান্নার গন্ধটা তার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিল। ঠিক যেন মায়ের রান্নার গন্ধ। হ্যা, পেয়ে গেছে আনিস! লতা ভাবি ফেলে গেছে তার মায়ের রান্নার গন্ধ। যার সাথে আনিসের আজন্ম পরিচয়। সেই জিনিষ রেখে গেছে। এই গন্ধ নিজের পরিবারের একটা চিত্র ফুটিয়ে দিল চোখের সামনে। মা কত দিকে কত মেয়ে দেখেছে। একটা বউ চাই। পছন্দমত মিলেনি। আজ লতার পাশে মাকে কল্পনা করতে লাগল আনিস। মা, একটা বউ, এমন সংসার। কোথায় মিলবে পছন্দের বউ! মা এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে। এসব আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে আনিস গোসল করতে গেল।

আনিসদের লিভিং রুমটা বেশ বড়। এক পাশে একটা ডাইনিং টেবিল। চারটা চেয়ার। এর মালিক কেউ নয়। যারা এ বাসায় থাকে তারা সবাই মালিক। এই টেবিল চেয়ারগুলো আগে যারা ছিল তাদের। কে এসবের আসল মালিক কেউ জানেনা। আনিস ভাত তরকারী নিয়ে টেবিলে রাখল। খেতে বসে তার মনে পড়ল লতা ভাবীকে একবারও বলা হয়নি খেয়ে যেতে। এক সাথে বসে খেলে কেমন হত! পিকনিকটা জমত ভাল। রান্না করে দিয়ে না খেয়েই চলে গেল। এমনি এলোমেলো ভাবতে ভাবতে আনিস আনমনা হয়ে গেল।

তার খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় ঘরে ঢুকল জগলু। সাথে একটা সুন্দরী মেয়ে। বয়স আঠার উনিশের মত। আনিসকে হাই বলে ওরা রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আনিস বিছানায় শুয়ে মনে মনে অনেক হিসাব মিলাতে চেষ্টা করতে লাগল। কত মানুষ কত ভাবে হিসাব মিলায়। হিসাবের মিল না হলে কোন কিছুই মিলেনা।

-২২-

আনিস চার্চ এভিনিউতে গেল। একটা খবরের কাগজ নিয়ে ঘরে ফিরবে। প্রথমেই ঠিকানা পত্রিকাটা হাতে নিল। প্রথম পৃষ্ঠার খবর দেখে পেছনের পাতায় চোখ বুলাতেই চোখ আটকে গেল। বড় করে তিন কলামে ছাপা হয়েছে, ‘বাহার আউট’। কিসে থেকে আউট? কে আউট করল? কেন? তিনি কি কোন হকি টিমে আছেন নাকি? কৈ, কিছু বলেননি তো! এক নিঃশ্বাসে খবরটা পড়ে ফেলল। বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এন্ড রাইটার্স এসোসিয়েশান থেকে তিনি আউট। আউট করেছে সহ

সভাপতি এবং কমিটির অন্যান্যরা। ব্যাপারটা বিশদ জানার জন্য সে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল। এসেই টেলিফোন করল। বাহার বাসায় নেই। বিন্দু ভাবী বলল অফিস থেকে ফিরবে পাচঁটার পর। এখন বাজে তিনটা। এতক্ষণ তার ধৈর্য থাকবেনা। বিন্দুকে জিজ্ঞেস করল, ভাবী আপনি জানেন কি বাহার ভাইকে এসোসিয়েশন থেকে আউট করেছে?

হ্যা, ও জানে। ওরা তাকে আউট করবে। সেও চায়না এমন সব লোকদের সাথে বসতে। মনে হচ্ছে তুমি খুব উত্তেজিত হয়ে গেছ। উত্তেজিত হবার কিছু নেই। এখানে এমন হয় যখন তখন। সব সংগঠনেই বহিষ্কার পাল্টা বহিষ্কার হয়। একটা ভেঙ্গে কয়েকটা হয়। তুমি তার সাথেই আলাপ কর। অফিস থেকে আসুক।

পাচঁটা আর বাজেনা। বসে বসে হিসাব করছে। পাচঁটার সময় ছুটি হলে ঘরে ফিরতে অন্তত আরও আধ ঘন্টা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আনিস। বাংলাদেশে ছাত্রলীগ করত আনিস। দু'বার গ্রেফতারও হয়েছে। বেশীদিন রাখতে পারেনি। সেখানেও দল ভাগ হয়। কিন্তু এমন এক তরফাভাবে কাগজে খবর ছাপা হয়না। তার আগ্রহ সব ঘটনা জানার।

অবশেষে পাওয়া গেল বাহারকে। প্রথমেই আনিসের প্রশ্ন, আপনি জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত তা তো বলেন নি।

এটা বলার এমন কিছু নয়।

আজ ঠিকানা পত্রিকা দেখেছেন?

না, এখনও দেখিনি।

আপনাকে আউট করেছে। তিন কলামে।

তোমার নিজের পত্রিকা হলে পাঁচ কলামে দিলেই বা কে কি বলবে। শাহীনের নিজের পত্রিকা। যত কলাম ইচ্ছে খবর ছাপতে পারে। এটা এমন কিছু নয়।

ব্যাপারটা কি বলুন তো।

ব্যাপার কিছু নয়। আমি তাদের ইচ্ছামত কাজ করি নাই। সংবিধান বিরোধী কাজে সই করি নাই। আমাকে তারা যা মনে করেছিল আমি তা নই দেখে তারা হতাশ। তাই আউট।

একটু খুলে বলুননা, আনিস বলল।

সংক্ষেপে বলি শোন। ১৯৮৮ সালে যখন এদেশে আসি তখন খুব একা ফিল করছিলাম। বন্দুবান্ধব কেউ নেই যে কোথায়ও বসে একটু আড্ডা দিব। কিছু লেখা ছিল। তখন দুটো খবরের কাগজ। প্রবাসী আর ঠিকানা। ঠিকানা পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম কিছু লেখা। তারা ছাপল। ১৯৯০র মে মাসে হঠাৎ ঠিকানা পত্রিকা থেকে ফোন পেলাম। একটা ইফতার পার্টি করছে। ঠিকানায় লেখকদের নিয়ে। একটু দেরীতে উপস্থিত হলাম। একজনও পরিচিত নয়। সবাইর সাথে পরিচয় হল। ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদক শাহীন, সহকারী রব, ঠিকানা পত্রিকার সাথে যারা কাজ করেন তাদের কয়েকজন। যাদের নাম এখন মনে আছে তারা হলেন বাসেত ভাই, শাহ নেওয়াজ, শামীম প্রমুখ। লেখক আরও যারা ছিলেন তারা হলেন লিয়াকত হোসেন আবু, শওকত আলী, তাসের খান, কাজী ফয়সল আরও অনেকে। ইফতার শেষে সবই একমত হলেন এখানে লেখকদের নিয়ে একটা এসোসিয়েশন বিশেষ প্রয়োজন। শুনে মনটা খুশীতে নেচে উঠল। যাক, একটা আড্ডা দেবার জায়গা হবে। আমি আড্ডাবাজ মানুষ। এখানে এসে একবারে ঘরকুনো হয়ে গেছি। তাই তাদের সাথে সহযোগিতা করব বললাম। অনেক আলোচনার পর নাম স্থির হল। "বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এন্ড রাইটার্স এসোসিয়েশন"।

আনুষঙ্গিক কাজকর্ম এবং সংবিধান রচনার জন্য কমিটি করা হল। নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচনের একটা তারিখ সংক্রান্ত কাজকর্ম এগিয়ে চলল। সংবিধান রচনায় আমার নামও রাখা হল।

মিটিং চলছে প্রায় প্রতি সপ্তাহে। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে। আমাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। কে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন, কে সেক্রেটারীর পদে আসীন হবেন এসব নিয়ে। হঠাৎ করেই দেখা গেল দু'টা দল হয়ে গেছে। কথাবার্তা অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি প্রতিদিন মিটিংএর পেছনে বসে বসে সব বাদানুবাদ শুনি। কোন মন্তব্য করিনা। একদিন তো তাসের খান আর শওকতের হাতাতির অবস্থা। সেদিনই স্থির করলাম এখানে আর নয়। আমার কাঙ্খিত আড্ডার জায়গা এটা নয়। মিটিংএ আর যাইনা।

একদিন শাহীন আর আবু বাসায় এসে উপস্থিত। বাহার ভাই আজ আপনার এখানে খাব। তারপর আমাদের বিপদের কথা বলব। অনেক ভণিতার পর বলল, আপনাকে সভাপতির দায়িত্ব নিতে হবে।

শুনে বিন্দু একবারে তেড়ে আসল। আপনারা আর কাউকে পান না সভাপতি করার জন্য? তাকে কেন? বাংলাদেশে এসব করেই অনেক ক্ষতি করেছে। এই বিদেশে এসব কেন? আপনারা অন্য লোক দেখুন। শেষে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এসব নিয়ে থাকবে। ঘরের দিকে কোন খেয়াল থাকবেনা। মেহেরবাণী করে আর কাউকে নিন।

উপযুক্ত আর কাউকে তো পাওয়া যাচ্ছেনা। বলে আরও অনেক যুক্তিতর্ক আবেদন নিবেদন করেও বিন্দুকে রাজি করাতে পারেনি। আমিও হ্যাঁ বলতে পারছিনা। কারণ তাদের যে অবস্থা দেখেছি তাতে সেখানে ভদ্র পরিবেশও বজায় থাকেনা। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার আগেই ভাঙ্গনের সঙ্কেত শোনা যাচ্ছে। লড়াইএর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আমি এক বাক্যে বলে দিলাম, আমি অসুস্থ মানুষ। এসবের মাঝে থাকতে চাইনা। আপনারা করুন, আমি মাঝে মাঝে আড্ডায় অংশ গ্রহন করব।

শেষ পর্যন্ত শাহীন বলল, আপনি কি চান একজন রাজাকার সভাপতি হোক?

এইবার সেরেছে! রাজাকার সভাপতি হবে? কে সে রাজাকার? আমি তো কাউকেই ভাল করে চিনি না। তাহলে আপনারা কেউ এগিয়ে আসুন। রাজাকার ঠেকান।

আমাদের মাঝে আর কেউ নেই যে শওকতকে ঠেকাতে পারে। একমাত্র আপনি পারেন। আপনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, আপনার পক্ষে সবাই ভোট দেবে।

শওকত যে কে, কি তার পরিচয় তার কিছুই আমি জানিনা। তাদের কথার উপর বিশ্বাস করলাম। শওকত রাজাকার। এখানে তো অনেক রাজাকার মুখোশ পড়ে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে। বোধ হয় শওকতও একজন। জান দিয়ে হলেও রাজাকার ঠেকাতে হবে। তাহলে আমি রাজি। যান, আপনারা এগিয়ে যান।

আমি সভাপতি হলাম। পরে জানলাম শওকত রাজাকার তো নয়ই, বরং একজন আওয়ামী লীগ কর্মি। পত্রিকার মালিক হিসাবে শাহীন চায় সে নিজে এই সংগঠনকে তার হাতের মুঠোয় রাখতে। শওকত বেশি কথা বলে। তাকে হাতের মুঠোয় রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। তাই আমার মত একজন নিরীহ মানুষ শাহীনের প্রয়োজন। যখন যা বলে তাই করব। কোন অসুবিধা হবেনা। এটা অঙ্কের ব্যাপার। সোজা মিলে যায়।

কমিটি হল। আমি সভাপতি,শওকত সহ-সভাপতি, লিয়াকত হোসেন আবু সম্পাদক,যে নাকি শাহীনের ডান হাত। তাসের খান মাহমুদ, সহ-

সম্পাদক। তাসের শাহীনের মুখের উপর কথা বলে। আরও যারা এ কমিটিতে ছিলেন তারা হলেন নওয়াজ বিন মান্নান, আতাউর রহমান, সাইদ-উর-রব, মনিরুল ইসলাম, ডঃ ফয়সল খান, কাজী শামসুল হক, আনিসুজ্জমান খোকন, এম এম শাহীন, আবু সাইদ সাহিন, কাজী ফয়সল আহম্মদ। শাহিন খুশী। তার মনের মত কমিটি। এবার শুধু কাজ করে যাওয়া।

নতুন কমিটির দ্বিতীয় সভার পরেই শাহীন বলল, বাহার ভাই, তাসেরকে বের করে দেন।

কেন?

ওর কথাবার্তা ঠিক না। যা মুখে আসে তাই বলে। এ লোক দিয়ে সংগঠনের কোন কাজ হবেনা।

আমি ইচ্ছা করলেই তো বের করে দিতে পারিনা। তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আনুন। কমিটিতে পেশ করুন। যদি মেজরিটি বলে তাহলে বের করে দিবেন। তাতে আমার করার কিছু নেই।

আপনি ইচ্ছা করলেই তো পারেন। কমিটি আমার হাতে আছে। আপনি বললেই হল।

না, আমি তা পারবনা।

এই শুরু হল শাহীনের সাথে আমার মতপার্থক্য। কমিটিতে শাহীন একজন সদস্য মাত্র। তার অনুমতি ছাড়া কিছু করতে গেলেই সে ক্ষেপে যায়। মনে হল আমি তার হাতের পুতুল। সে পত্রিকার মালিক। আমাকে যা বলাবে তা বলব, যা করাবে তা করব। কিন্তু আমি শাহীনকে বাদ দিয়েই কাজ শুরু করলাম। কিছুদিন পরেই বিখ্যাত কলামিষ্ট আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করলাম। সেখানে শুধুই প্রশ্ন করা হবে, উত্তর দেবেন গাফ্ফার চৌধুরি। সে অনুষ্ঠান সম্মন্ধে শাহীনকে কিছুই জানানো হয়নি। তাই শাহীন ক্ষেপে গিয়ে অনুষ্ঠানে ঝামেলা করতে চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে চেঁচামেচি চিৎকার শুরু করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়। তারপর আমি শাহীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি। তারা অভিযোগ আনে তাসেরের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে তারা জরুরী সভার জন্য আমার কাছে আবেদন করে। আমি পিছিয়ে দিই। পরবর্তিতে তারা সকলে মিলে আমার কাছে চিঠি পাঠায় এই বলে যে গত সপ্তাহে মিটিংএর স্থান ও তারিখ ঠিক করা হয়েছে। আমি যেন সেখানে সভাপতিত্ব করি। কিন্তু আমার সে সভায় এবং এসব লোকদের সাথে বসার কোন ইচ্ছা নেই। তাই বলে দিলাম আমি যাবনা। তারপর শাহীন তার সমর্থকদের নিয়ে সভা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা শুধু শাহীনের পত্রিকার খবর। অন্য কোন পত্রিকায় নেই। আমার এ সংগঠনের সভাপতি হয়ে কাজ নেই। আমি যা চেয়েছিলাম তা এ সংগঠন নয়। আমি চাই একটা আড্ডার জায়গা। যেখানে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে, আড্ডা হবে। আমার সে ইচ্ছা আমি বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করব। ভালই হল। একটা সাহিত্য আসরের চিন্তা করা যাবে এখন। যেখানে কোন কমিটি থাকবেনা। কমিটি থাকলেই দলাদলি হয়, কাজের কাজ কিছুই হয়না। নিজের নাম প্রকাশে সবাই ব্যস্ত থাকে।

তাই করুন। এখানে সমমনা মানুষ নিয়ে একটা আড্ডার ব্যবস্থা করুন।

আলহাজ কুরবত হুসেন বরবাদি এখন নিউইয়র্কে। বাংলাদেশে তিনি একজন ধর্মীয় নেতা। এক কালে তিনি দাঁদের মলম বিক্রি করতেন। তার গলা খুব ধারালো। সুর করে কথা বলে তিনি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পটু। বক্তৃতা দেয়ার হাতে খড়ি মলম বিক্রি করেই। তারপর একসময় তিনি ধর্মিয় দলে যোগদান করে ১৯৭১ সালে অগণিত নিরীহ মানুষ খুন করে নেতার প্রথম কাতারে উন্নিত হন। বর্তমানে তিনি ধর্মকে মূলধন করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। দেশে এবং বিদেশে। বিদেশে তার নেটওয়ার্ক বিশাল। প্রায় সব দেশেই তার কর্মি ছড়িয়ে আছে। ধর্মের নামে মানুষ খুন করার কর্মি। এখানে কর্মি দর্শণে এসেছেন। গত কয়েক বছরে তিনি যেসব ভক্ত এই দেশে চালান করেছেন, যারা এই বিধর্মীর দেশে বসবাস করছে তাদের ঈমান ঠিক আছে কিনা পরখ করবেন। মানুষকে দ্বীনের তালিম দিতে হবে। কর্মীরা নিজেদের সুবিধা অসুবিধা সাংসারিক ঝামেলার কথা হুজুরের কাছে পেশ করে তার সুরাহা করার আবেদন জানায়। হুজুর দোয়া করেন, তাবিজ দেন। তাবিজের হাদিয়া নেন। দ্বীনের কাজের জন্য দান গ্রহন করেন। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ফিরিয়ে আনার জন্য বানের ব্যবস্থা করেন। যে সব স্ত্রীরা স্বামীর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে তিনি নবী করিমের উদাহরন দিয়ে অনেক রকমের হাদিস বয়ান করেন। মনের কলুষতা দূর করেন। প্রয়োজনে নির্জন ঘরে তিনি উপদেশ দেন এক দু দিন। এই চিকিৎসায় অনেকেই রাতারাতি ফল পেয়ে যান। প্রায় প্রতিদিন তিনি দাওয়াত কবুল করেন। এখানে সেখানে দ্বীনের আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। তার খেদমতের কোন অসুবিধা হয়না। ওজন পার্কে ২৬৮ স্ট্রিটে জামালের নিজস্ব বাড়ীতে তিনি তসরিফ রেখেছেন। জামালের স্ত্রী খুব সুন্দরী। বয়স ২৪/২৫ হবে। তিনটা ছেলে মেয়ে। হুজুর যে কয় দিন থাকবেন তার খেদমতের জন্য জামালের স্ত্রী কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে।

বাড়ী কেনার আগে জামাল হুজুরের অনুমতি নিয়েছিল। হুজুর তখন বাংলাদেশে। টেলিফোনে হুজুরের সাথে সব কথা বলে অনুমতি চেয়েছিল। হুজুর মেহেরবানী করে অনুমতি দিয়েছেন। জামাল বাংলাদেশে থাকাকালিন সময়ে হুজুরের অনেক সাহায্য লাভ করেছে। এই বিদেশে আসার ব্যাপারেও হুজুর সাহায্য না করলে আসা সম্ভব ছিলনা। কোন কাজই হুজুরের অনুমতি ছাড়া জামাল করেনা। এই যে একটা গ্রোসারী প্লাস সেন্ডুইচের দোকান ক্রয় করেছে তাও হুজুরের অনুমতি নিয়েই করেছে। এদেশে এসে জামাল অনেক পরিশ্রম করেছে। তার চেয়ে বেশি করেছে তার স্ত্রী। জামাল চৌদ্দ ঘন্টা কাজ করত। তার স্ত্রী কাজ করত বাসায়। লিভ ইন নান্নী। সিনিওয়র মানুষের সেবা করা। প্রথমত করত ৯০ বছরের এক বৃদ্বের সেবা। তার দু ছেলে। বৃদ্ব বয়সে বিয়ে করে বাবা হয়েছে। স্ত্রী চলে গেছে অন্যের সাথে। ছেলেরা কলেজে পড়ে। বাবার সেবা করা বা দেখাশোনা করা তাদের কাজ নয়। সরকার দেখবে। সরকার টাকা দেবে দেখাশোনা করার জন্য। একজন কৃষ্ণ বর্ণের মহিলা দেখাশোনা করত। আর একটা ভাল কাজ পেয়ে চলে গেছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে এই বৃদ্ধের একজন কাজের মহিলা প্রয়োজন। জামালের বন্ধু খবরটা দিয়েছিল। পরের দিন যাবার সাথে সাথেই কাজ হয়ে গেল। ঘন্টায় বিশ ডলার। শুনে জামালের স্ত্রী আমেনা বিশ্বাসই করতে পারেনি। বিশ ডলার! ঘন্টায় বিশ ডলার দিলে যে কোন কাজ করতে রাজি। সেই থেকে কাজে লেগে গেল। বৃদ্ধের দেখাশোনার সাথে সাথে দু ছেলেকেও দেখাশোনা করতে হয়। রাত্রি যাপন করতে হয় সেখানেই।

এক বছর পর বৃদ্ধ মারা যাবার পর আর এক বাসায় কাজ নেয়। এখানে স্বামী স্ত্রী দুজনকে দেখতে হয়। তার সাথে ঘরের অন্যান্য কাজ। বেতন ২৫ ডলার। তবে এখানে বেলা বারটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত।

জামাল এবং তার স্ত্রী মিলে পরিশ্রম করে অনেক টাকা জমা করেছে। কাজের ব্যাপারেও হুজুরের সাথে আলাপ করে অনুমতি নিয়ে নেয়। হুজুর আসার আগেই জামালকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে। এয়ারপোর্টে জামাল গিয়ে দেখে আরও অনেক জামাত ভাই অপেক্ষা করছে হুজুরের জন্য। সেখানে সৈয়দ মুক্তাদির এবং আশরাফুজ্জমান খানও আছেন।

হুজুর তসরিফ নিয়ে এয়াপোর্টের বাইরে এসে বললেন, জামালের বাসায় চল। তারপর অন্যখানে।

তিনি বাসায় পৌছার সাথে সাথে আমেনা বদমবুছি করে তার সেবাযত্নে লেগে গেল। অনেক পরিশ্রম করে এসেছেন। এত বড় লং জার্নি। তিনি একবারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যত রকমমের উপাদেয় খাদ্য তিনি পছন্দ করেন তা পরিবেশন করে, তার খাবার টেবিলে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করলেন সকলে। তারপর বিশ্রাম। তিনি ক্লান্ত, মাথা ধরেছে। আমেনা মাথা টিপে দিচ্ছে। জামাল পা টিপে দিচ্ছে। হুজুর যে কয়দিন তসরিফ রাখবেন আমেনা কাজে যাবেনা। একজন কৃষ্ণাঙ্গি ঠিক করেছে। তার জায়গায় কাজ করার জন্য।

পরের কাজ করলে ছুটি নেয়া যায়। নিজের কাজে ছুটি মিলেনা। জামাল তার গ্রোসারী বন্ধ রাখতে পারেনা। তাই সে সকালে চলে যায়। আমেনাকে বলে যায় হুজুরের খেদমতের যেন কোন ত্রুটি না হয়। বাচ্চারা স্কুলে চলে যায়। জামাল ফেরে রাত দশটায়।

বাহারের সাথে জামালের পরিচয় ১৯৮৮ সালে। বাহার যখন কলিমুল্লার বাসায় উঠল তখন জামাল গিয়েছিল দেখা করতে। কোন সাহায্য সহযোগিতা লাগবে কিনা জানার জন্য। বাহারের পদবী মোল্লা জেনে জামাল মনে করেছিল নিশ্চয়ই বরবাদীর ভক্ত। বাহারের বাসায় পৌঁছে জামাল তার পরিচয় দিয়ে হাতে হাত, বুকে বুক মিলিয়ে যখন বলল, শুনলাম একজন বাঙালি নতুন এসেছে, তাই দেখা করতে এলাম। আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয় যদি তাই জানতে এলাম। আপনি বরবাদি হুজুরের মাধ্যমে এসেছেন?

না, আমি বরবাদিকে চিনিনা এবং তার মাধ্যমে আসার প্রশ্নই আসেনা।

শুনে জামাল হতাশ হয়ে খুব বেজার হয়ে গিয়েছিল।

তারপরও মাঝে মাঝে ফোন করে। বাড়ী কিনার পর মিলাদের দাওয়াত দিয়েছিল। যদিও বাহার আসতে পারেনি। পরে যখন দোকান নিয়ে মিলাদের দাওয়াত দিল তখনও বাহার আসবে কি আসবেনা ভাবছিল। তার অনেক অনুরোধে শেষ পর্যন্ত এসেছিল। ১২-৩৭ ৬৮ ষ্ট্রিট, ওজন পার্ক। মিলাদ শেষে দোকানে শুকরের গোস্তের সেন্ডুইচ দেখে বাহার জিজ্ঞেস করেছিল, এটা বিক্রি করা হালাল কিনা বা এটা বিক্রি করে যে লাভ হয় তা হালাল কিনা। উত্তরে জামাল বলেছিল হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করেই তিনি এটা বিক্রি করেন। হুজুর কিভাবে কোন এঙ্গেল থেকে কি ফতোয়া দিয়ে হালাল করেছে তার বিশদ জামাল দিতে পারলনা।

গ্রোসারীতে হ্যাম স্যান্ডুইচ বিক্রি হয়। জামাল নিজ হাতে শুকরের স্যান্ডুইচ তৈরি করে বিক্রি করে। সেই স্যান্ডুইচ বিক্রির লভ্যাংশ তার বাসায় খরচ করে, খাওয়া দাওয়া চলে। বরবাদী নিজেও তার ভাগ ভোগ করে যখন জামালের বাসায় থাকে।

অন্যান্য ভক্তরা অপেক্ষা করছে। কবে তিনি কার বাসায় তসরিফ নিবেন। একটা ফর্দ করা আছে। কে কে দাওয়াত করে রেখেছে। পাঁচ দিন জামালের বাসায় থাকার পর তিনি তসরিফ নিলেন সৈয়দ মুক্তাদিরের বাসায়। সকলেই হুজুরের দোয়া প্রার্থনা করেন। কিছু উপদেশ ইত্যাদি। সৈয়দের এতবড় বাসায় রুমের অভাব নেই। হুজুরের সন্মার্থে সৈয়দের বেডরুমের পাশে বাচ্চাদের বেডরুমটা হুজুরের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়া হল। হুজুর যে কয়দিন থাকবেন লতা তার দেখাশোনা করবে। সৈয়দ সাহেব যখন তখন এসে খবর নিতে পারবেন।

বাসায় বসে হুজুরের বক্তৃতা সবাই শুনতে পায়না। অনেক ভক্ত আছে যারা হুজুরকে বাসায় নিতে পারেন না বা হুজুর সময় দিতে পারেন না। তাদের অনুরোধে সৈয়দ সাহেব ম্যানহাটানের একটি হল ভাড়া করেছে। বিরাট ওয়াজ মাহফিল। বক্তৃতা করবেন কুরবত হোসেন বরবাদী। কয়েকটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। বরবাদিভক্তদের মাঝে একটা সাজ সাজ রব। সৈয়দ সাহেব জানেন এ রকম বক্তৃতা অনেকটা ঝুকিপূর্ন। তাই সিটি অফিসে দরখাস্ত করে বরবাদীর জন্য নিরাপত্তা প্রহরীরর ব্যবস্থা করেছে। দশ জন পুলিশ পাহারা থাকবে যতক্ষন হুজুর বক্তৃতা করবেন এবং বাসায় ফেরৎ না আসবেন। বরবাদীর প্রহরী হিসেবে থাকবেন আরও ১০/১৫ জন জামাত কর্মি। হুজুরকে সব রকম নিরাপত্তা দিতে হবে। যারা কাজ করে তারা বরবাদীর জন্য শহীদ হতেও প্রস্তুত। এই প্রহরীদের কমান্ডার হলেন মৌলানা আহমদ আলী। তার পোষাক আশাক সৌদির মত - মনে হয় কোনদিন দাড়ি ফেলেননি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। অবিবাহিত বলে পরিচিত। কাগজ নেই। চেষ্টায় আছেন। সেকেন্ড ইন কমান্ড হলেন ছমিরউদ্দিন। বয়স পঞ্চাশের উপর। শক্ত সামর্থ শরীর। দেখলে মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি। দেশে আল্লাহর আমানত ১১ ছেলে মেয়ে এবং একজন মাত্র স্ত্রী আছে। তিনি রওয়ানা হয়েছেলিন আল্লাহর পথে জামাত করার মানসে। অনেক দিন চেষ্টা করে দ্বীনের কাজ করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছেন এই নাছারার দেশে। ইসলাম রক্ষা করতে। তিনি প্রায়ই মসজিদে সময় কাটান, ঈমান নড়বড়ে হয়ে যাওয়া মুসলমানকে ঈমান পোক্ত করায় সাহায্য করেন। এখানে থাকার জায়গা নেই বলে আহামদ আলী তার মেসে একটা সিট দিয়েছে। তারা এক সাথেই থাকে। সপ্তাহে তিন দিন কাজ করে একটা সিকিউরিটি কোম্পানীতে। অন্য এক জনের সোসাল সিকিউরিটি কার্ড দিয়ে। অন্য নামে। সিকিউরিটির কাজটা খুব সোজা। ইউনিফরম পরে শুধু ঘুরে বেড়ানো। শুধু ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝে তাকানো। আর কতক্ষন আছে, থাকতে হবে কতক্ষন। কোন ঘটনা ঘটলে শুধু কাগজে লিখে রাখা। একদম সোজা কাজ। এমন কাজ পেলে দেশে আর ফেরত না গেলেও চলবে। কাগজের জন্য অত ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। যেভাবে চলছে সেভাবে চললেই হল। পকেটে ডলার আসলেই হল।

আর এক জন দেহরক্ষী হলেন ওজন পার্ক মসজিদের ঈমাম মাওলানা করিমউল্লা। তিনিও যথেষ্ট বয়ান করতে পারেন। তিনি যখন ওয়াজ করেন তখন মমিন মুসল্লিরা চোখের জল রাখতে পারেনা। ব্রুকলীন মসজিদের ঈমাম আব্দুল কাদেরও আছেন এই দেহরক্ষী কমিটিতে। এরা এদেশে এসেছে বরবাদীর সাহায্যে। কিভাবে, কোন্ হাতের স্পর্শে তাদের ভিসা হয় তারা নিজেরাও জানে না। যা কিছু করে হুজুর নিজেই

করেন। তারা শুধু বরবাদি হুজুরের দোয়া প্রার্থনা করে পরামর্শ নিয়ে কাজ শুরু করে।

নিউইয়র্কে বরবাদীবিরোধিরা সংঘবদ্ব হল। বরবাদির বক্তৃতার বিরোধিতা করবে। কয়েক হাজার লোক জমায়েত হল সেই হলের সামনে। প্রতিবাদের ব্যানার নিয়ে। দেশোদ্রোহি রাজাকার নিপাত যাক। বরবাদি নিউইয়র্ক ছাড়। দেশের শত্রু বরবাদী। ইত্যাদি অনেক রকমের ব্যানার। এত এত মানুষের মাঝ দিয়ে অনেক পরিচিত অপরিচিত মানুষ বরবাদীর সভায় যোগদান করছে। বেশ কিছু পরিচিত মুখ বাহারের চোখাচোখি হয়ে গেল। তারা মাথা নুইয়ে আস্তে করে ঢুকে গেল হলে। তাদের মুখোশ খুলে গেল। অথচ বাইরে তারা অন্য কথা বলে। তারা নিজেদের কেউ কেউ নেতা বলে দাবী করে।

জাহাঙ্গির বলল, দেখলে তো বাহার, ঐ শালাদের চেহারা? এ হল তাদের আসল চেহারা। এখানে না আসলে তো এই চেহারাগুলোর মুখোশ ধরা পড়তনা। বি এনপি জামাত ওরা যাবে জানা কথা। আওয়ামীলীগ করে সে লোকটা গেল কেন?

কারন আছে। বাহার বলল। ওখানে মাজারের জন্য কত সাহায্য উঠবে, এতিমখানার জন্য কত, মাদ্রাসার জন্য কত, আর মসজিদের জন্য কত উঠবে তার একটা হিসাব জানা দরকার। চেহারাগুলো দেখা দরকার কার পকেট থেকে কত গেল। কে আল্লার ঘরে দেয়, আর কে মাদ্রাসায় দেয় আর কারা এতিমদের সাহায্য করে। পয়সা নেবার এসব ফন্দি। আসলে সব যাবে বাইদীর পকেটে। এসব খবর বাইদীর ভক্তরা তো বলবেনা। তাই রহমান গেছে ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখার জন্য। মাঝখান থেকে ফাও কিছু ছওয়াব নিয়ে আসা। উদ্দেশ্য খারাপ না।

আনিস হেসে বলল, তাহলে আপনিও যান না, কিছু ছওয়াব নিয়ে আসুন।

আমার লাগবেনা। সৌদি আরব থেকে যা ছওয়াব নিয়ে এসেছি তা অনেক।

চার ঘন্টা পর ওয়াজ মাহফিল শেষ হল। সবাই ঘরে ফিরে গেল।

অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চারজন দেহরক্ষী সর্বক্ষন বরবাদীকে পাহারা দিয়ে ঘর পর্যন্ত পৌছে দিল।

ঘরে ফিরেই আনিস লতা ভাবীকে ফোন করল। আজ তিন দিন কোন খবর নেই। বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আনিসের এখানে চলে আসে। দুটার দিকে চলে যায়। এখন এটাই নিয়মে দাড়িয়েছে। না আসতে পারলে ফোন করে। আজ তিন দিন হল আসেও না, ফোন ও করেনা। প্রতিদিন সে অপেক্ষা করে, এই বুঝি এল! অথবা এই বুঝি ফোন আসবে। কিন্তু আসেনি। সে দুএকবার ফোন করেছিল, কিন্তু কেউ ফোন উঠায়নি। এবার অনেকক্ষন রিং হবার পর ভাবী উঠাল ফোন। খুব ক্ষীন কন্ঠ। হেলো, ভাবী? জোরে বলুন। শুনতে পাচ্ছিনা। আপনি কি অসুস্থ? আরও দুদিন ফোন করেছিলাম। কেউ উঠায়নি ফোন। আপনি কেমন আছেন?

আমি আপনাকে ফোন করছি। এখন রেখে দিন। অন্য রুম থেকে কল করব।

দশ মিনিট পরই ফোন বেজে উঠল। হ্যালো, ভাবী?

হ্যা, আছি অনেক ব্যস্ত। ঘরে একজন সন্মানিত মেহমান আছে আজ চার দিন। তাই কোথায়ও যাবার সময় নেই। তাছাড়া ঘরের কাজ এত বেড়ে গেছে যে এক মুহূর্ত সময় পাইনা। সব সময় মেহমানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তিনি কখন কি চান, কি প্রয়োজন হয়।

কোন মেহমান? বাংলাদেশ থেকে এসেছে?

হ্যা, তিনি মাওলানা বরবাদী।

বরবাদী আপনার বাসায়?

হ্যা, তিনি তো আমাদের বাসায় আজ চার দিন।

আর আপনি তার সেবা করছেন?

কি করব? উপায় নেই। আমার স্বামীর ইচ্ছা তার খেদমত করি। সৈয়দ সাহেব তাকে পীরের মত মানে। কোন সময় কিছু কাজ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে হয়। নিরুপায় হলেও কর্তব্য পালন করতে হয়। লোকটার চাহনী আমার একদম ভাল লাগেনা। কথা বলে মা মা বলে কিন্তু এমনভাবে তাকায় যেন গিলে খেয়ে ফেলবে। যখন তখন এটা সেটা চায়, আদেশ করে। যেন তার চাকর। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বলি, আপনি অন্য বাসায় যান না কেন? এ বাসায় তো বেশ কিছুদিন হল। এবার অন্য বাসায় যান। মুখে এনেও বলতে পারিনা। যদি আবার সৈয়দ সাহেবকে বলে দেয়।

আরে দূর! ওর জন্য কিচ্ছু করবেন না। সৈয়দ সাহেব যা ইচ্ছা তা বলুক। দরকার হলে আপনি আমার এখানে চলে আসুন। বলেই আনিস ভাবল, এটা কেমন কথা হল! এখানে আসবে কেন? তিনি তো সৈয়দের বিয়ে করা বৌ। তার আদেশ মানাই তার কর্ম। লতাকে আবার বলল, আপনি আপনার রুমে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। ডাক দিলেও শুনবেন না। অসুখের ভান করুন। কয়েকবার ডাকার পর চুপ মেরে যাবে। একটা রাজাকারের সেবা করার কোন মানে হয়না।

আপনার বলা লাগবেনা। গতকাল থেকে শুরু করেছি। রাতে রান্নাও করিনি। পানি দিয়ে চোখ লাল করে সৈয়দ সাহেবকে বলেছি সারাদিন মাথাধরা ইত্যাদি। দুপুরের রান্না করা খাবার দিয়েই চালিয়ে দিয়েছি। ভাব দেখে মনে হয় আর বেশিদিন থাকবেনা।

এইতো কাজের কাজ! আজকে সৈয়দ সাহেবকে বলুন হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসতে। তাহলেই রাজাকার ভাগবে।

তারও দুদিন পর তিনি তসরিফ নিলেন আশরাফুজ্জমান খানের বাসায়। আশরাফুজ্জমান ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবি নিধন যজ্ঞের জল্লাদ। এদেশে বেশ আয়েসে জীবন যাপন করছেন। তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মি কয়েকদিন খুব চেঁচামেচি করেছে। কিন্তু এদেশের আইন খুনিদের আশ্রয় দেয়। তাই সামনে দিয়ে হেটে গেলেও তাকে কিছু করা যায় না। তিনি বরবাদির পেয়ারের লোক। বাকী দিনগুলো তিনি সে বাসায় আরাম করবেন।

ক্রমশঃ...